POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ
وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

এবং আকাশ সমূহ ও পৃথিবীতে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সকলের উপর আধিপত্য আল্লাহ্‌র। তিনি যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

' (সূরা আল মায়েদা: ১৮)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 25

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

24 জুন, 2021 ● 13 যুল কাআদা 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর বাণী

রাত্রিকালে দাফনকার্য

১৩৪০) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) এক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ান তাকে দফন করার এক রাত্রি পর। তিনি (সা.) এবং সাহাবারা দাঁড়ান এবং তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'এটি কার কবর?' লোকেরা বলল: অমুক ব্যক্তির কবর, কাল রাত্রিতে দফন করা হয়েছিল। তিনি (সা.) তার জানাযার নামায পড়েন।

হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদনী ওলীউল্লাহ্‌ শাহ (রা.) বলেন: হযরত জাবের (রা.) এর বর্ণনার ভিত্তিতে যা ইবনে হাব্বান উদ্ধৃত করেছেন, অনেকে এই ফতোয়া দিয়েছেন যে রাতে দাফন করা নিষেধ। ইবনে হুব্বান এর রেওয়ায়েত এর শব্দগুলি

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ اَنْ يُّقْبَرَ رَجُلٌ لَيْلًا اِلَّا اَنْ يُّضْطَرَّ اِلٰى ذٰلِكَ (فتح الباری جزء 3 صفحہ 265)

অর্থাৎ আঁ হযরত (সা.) রাত্রে দাফন করতে নিষেধ করেছেন, যদি না একান্ত বাধ্যবাধ্যকতা না থাকে। কিছু ফিকাহবিদ এই রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে ফতোয়া দিয়েছেন যে রাত্রিকালে দাফনকার্য নিষিদ্ধ। এই ফতোয়াটির অপনোদন করতে ৬৯ অধ্যায় রচিত হয়েছে। ইমাম মুসলিমও (রহ.) এক ব্যক্তির রাতে দফন করার বিষয়ে একটি রেওয়াত উদ্ধৃত করেছেন। সেখানেও এই উল্লেখ রয়েছে যে নবী (সা.) এ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন-

اِذَا كَفَّنَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهٗ

তোমাদের মধ্য হতে কারো কাঁধে নিজ ভাইয়ের দাফন ও কাফন সম্পাদন করার দায়িত্ব অর্পিত হয়, তখন সে যেন তা সুচারুভাবে সম্পাদন করে। এর থেকে প্রকাশ পায় যে অসন্তোষের কারণ ছিল ত্রুটিপূর্ণ সম্পাদন।

(সহী বুখারী, ২য় খন্ড)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১৪ ও ২১ শে মে এপ্রিল,২০২১
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত জার্মানী, ২০১৪ (জুন)

খোদা তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করে পাঠিয়েছেন যাতে মুসলমানদের মধ্যে তৈরী হওয়া অভ্যন্তরীণ ত্রুটি-বিচ্যুতি দুর করি এবং ইসলামের সত্যতা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরি আর বাহ্যিকভাবে যে সব আপত্তি ইসলামের বিষয়ে করা হয়ে থাকে সেগুলির উত্তর দিই ।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমণের উদ্দেশ্য

হযরত ঈসা (আ.) এর ক্রুশ থেকে জীবিত নেমে আসা এবং সেই ঘটনায় প্রাণ রক্ষা পাওয়ার বিষয়ে কুরআন শরীফে সুনিশ্চিত জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরিতাপ! বিগত এক হাজার বছরে যেখানে ইসলামের উপর বহু বিপদাপদ আপতিত হয়েছে, সেখানে এই বিষয়টিও অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত মুসলমানদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে পড়েছে যে হযরত মসীহকে জীবিত আকাশে উত্তোলন করা হয়েছে, যিনি কিয়ামতের কাছাকাছি সময় আকাশ থেকে নেমে আসবেন। কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীতে খোদা তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করে পাঠিয়েছেন যাতে মুসলমানদের মধ্যে তৈরী হওয়া অভ্যন্তরীণ ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করি এবং ইসলামের সত্যতা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরি আর বাহ্যিকভাবে যে সব আপত্তি ইসলামের বিষয়ে করা হয়ে থাকে সেগুলির উত্তর দিই আর অন্যান্য মিথ্যা ধর্মের বাস্তবতা প্রকাশ করে দিই। বিশেষ করে ক্রুশীয় ধর্মের। অর্থাৎ খৃষ্ট ধর্মের। অর্থাৎ তাদের ভ্রান্ত মতবাদের যেন মুলোৎপাটন করি যা মানুষের জন্য বিপদজ্জনক ও ক্ষতিকারক আর মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের বিকাশের পথে অন্তরায়।

হযরত ঈসা (আ.) এর প্রকৃত সত্য

তাদের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে একটি হল মসীহ্‌র আকাশে আরোহণ করা, দুর্ভাগ্যবশত মুসলমানেরাও তাদের এই মতবাদের সমর্থনে সরব হয়েছে। এই একটি মতবাদের উপরই খৃষ্টবাদের ভিত দাঁড়িয়ে আছে। কেননা খৃষ্টবাদে এই ক্রুশের উপরই নির্ভর করছে তাদের মুক্তি। তাদের বিশ্বাস, মসীহ তাদের জন্য ক্রুশীয় মৃত্যুকে স্বীকার করেছেন অতঃপর তিনি জীবিত হয়ে আকাশে চলে গিয়েছেন; এটিই তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রমাণ।

যে সব মুসলমানেরা ভুলবশত তাদের সঙ্গ দিয়েছে, তারা যদিও একথা বিশ্বাস করে না যে তিনি ক্রুশে মারা গিয়েছেন, কিন্তু এতটুকু অবশ্যই বিশ্বাস করেন যে তাঁকে আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে সত্য আল্লাহ্‌ তা'লা আমার নিকট প্রকাশ করেছেন তা এই যে, মরিয়ম পুত্র ঈসা তৎকালীন ইহুদীদের হাতে চরম নির্যাতিত হয়েছেন। যেভাবে একজন সত্যবাদীকে তাঁর যুগে নির্বোধ বিরুদ্ধবাদীদের হাতে নির্যাতিত হতে হয়। অবশেষে সেই ইহুদীরা ষড়যন্ত্র ও দুষ্কর্মের মাধ্যমে তাঁকে হত্যা করার এবং ক্রুশে দেওয়ার চেষ্টা করে। বাহ্যত তারা নিজেদের পরিকল্পনায় সফল হয়েছিল, কেননা, হযরত মসীহ ইবনে মরিয়ম ক্রুশে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'লা যিনি তাঁর সত্যবাদী ও প্রত্যাদিষ্টদেরকে কখনও বিনষ্ট করেন না, তিনি তাঁর প্রাণ রক্ষা করলেন। তিনি তাঁকে ক্রুশীয় অভিশপ্ত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন এবং এমন নিমিত্ত তৈরী করলেন যার দ্বারা হযরত ঈসা সেই ক্রুশ থেকে জীবিত নেমে এলেন। এ বিষয়টি প্রমাণের জন্য ইঞ্জিলেই বহু দলিল পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে সে সব আমি বর্ণনা করতে চাই না। ইঞ্জিলে বর্ণিত ক্রুশের ঘটনা পড়লে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে হযরত মরিয়ম পুত্র ঈসা ক্রুশ থেকে জীবিত নেমে এসেছিলেন। যেহেতু সেদেশে তাঁর বহু শত্রু ছিল, যারা তার প্রাণের শত্রু, যেমনটি তিনি পূর্বে উল্লেখ করেছেন- নবী কোথাও লাঞ্ছিত হয় না, কিন্তু তার মাতৃভূমিতে- এটি তাঁর দেশত্যাগের দিকে ইঙ্গিত করে। অতঃপর একথা চিন্তা করে তিনি দেশান্তরিত হতে মনঃস্থির করেন এবং তাঁর উপর ন্যস্ত নবুয়তের কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে তিনি বানী ইসরাইলের হারানো মেষপালের সন্ধানে বের হয়ে নাসিবান-এর দিক থেকে আফগানিস্তানের পথ ধরে কাশ্মীরে এসে পৌঁছন এবং সেখানে বসবাসকারী বনী ইসরাঈলদের মাঝে তবলীগ করতে থাকেন, তাদের সংশোধন করেন এবং তাদের মাঝেই মৃত্যু বরণ করেন। এটিই সেই সত্য যা আমার নিকট উদ্ঘাটিত হয়েছে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩০৩-৩০৪)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৪ (জুন) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

৮ জুন, ২০১৪ (অবশিষ্ট রিপোর্ট)

প্রশ্ন: যখন নিজেকে ওয়াকফ করার সময় আসে,তখন কি ওয়াকফ বজায় রেখে নিজের পছন্দ মত কর্মক্ষেত্রে যেতে পারব? যেমন, কেউ যদি পাইলট হতে চায়, সে কি হতে পারবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি ওয়াকফে নও। পাইলট হওয়া আপনার স্বপ্ন। আপনি প্রথমে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিন যে, যেহেতু পাইলট হওয়ার আপনার প্রবল বাসনা রয়েছে, আপনি কেবল পাইলট হতে পারেন, অন্য কিছু হতে পারেন না, তখন যুগ খলীফা হয় আপনাকে বলে দিবেন যে আপনি পাইলট হতে পারেন না কি পারেন না। অনুমতি পেয়ে গেলে পাইলট হয়ে যান। কিম্বা আপনি অনুমতি নিয়ে বলে দিন যে ওয়াকফে নও থেকে বের হতে চান। আপনার মা-বাবা আপনাকে ওয়াকফ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু যদি জামাতের প্রয়োজন না থাকে, তবে আমার এই বিষয়ে আগ্রহ আছে। অন্য কোন সময় অন্যভাবে জামাতের সেবা করে নিব। কিন্তু এই মুহূর্তে ওয়াকফে নও তালিকা থেকে আমাকে বাদ দিন।

ওয়াকফে নওদের জন্য আমি নির্দেশিকা দিয়ে রেখেছি। জামাতের পক্ষ থেকে নির্দেশিকা এবং কাউন্সিলিং সম্পূর্ণ হওয়া বাঞ্ছণীয়। আমাদের সব চেয়ে বেশি যাদের প্রয়োজন তারা হলেন ডাক্তার, শিক্ষক, অনুবাদক, বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী ব্যক্তি, প্রকৌশলী, আর্কিটেক্ট আর কিছু বিভাগ এমনও আছে যেখানে অনেক সময় উকিলেরও প্রয়োজন পড়ে। বিভিন্ন কারিগরী দক্ষতা রয়েছে, যে সব ছাত্ররা বেশি পড়াশোনা করতে পারে নি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদেরও দরকার পড়ে। এছাড়া কি প্রশ্ন করতে চাও করে নাও। অনেকে বলে থাকে যে তাদেরকে অন্ততপক্ষে দুই চার বা ছয় বছরের জন্য নিজেদের পছন্দ মত কাজ করার অনুমতি দেওয়া হোক। তাদেরকে তখন অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃত ওয়াকফ-এর অর্থ হল সেই কাজ করা যেটি জামাতের প্রয়োজন।

প্রশ্ন: আমাদেরকে ফেসবুক ব্যবহার করতে কেন নিষেধ করা হয়েছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন এটি অবৈধ আখ্যা দেওয়া হয় নি। ব্যবহার বন্ধ করতে বলা হয়েছে, কারণ অনেক খারাপ দিক সামনে এসেছে। তোমরা এখন ছোট, লোকেরা তোমাদেরকে কিভাবে ধীরে ধীরে ফাঁদে ফেলবে তা তোমরা এখনও বুঝতে পারবে না। তোমাদের শিক্ষা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত, তোমাদের চিন্তাধারা পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত তোমরা এটি ব্যবহার করো না। জামাতে আহমদীয়ার আলইসলাম.ওআরজি যে ওয়েবসাইট আছে সেখানেও ফেসবুক আছে। আমাদের প্রেস কর্তৃপক্ষও একটি ফেসবুক তৈরী করেছে, এর থেকে উপকৃত হও। ব্যক্তিগত ফেসবুক ব্যবহার করা থেকে এজন্য নিষেধ করা হয়েছে যে তোমরা পুরোপুরি জান না। অনেক সময় মানুষ অসৎ মানুষের ফাঁদে পড়ে যায়। পৃথিবীতে অসংখ্য ফেসবুক আকাউন্ট আছে। তারাও এখন বুঝতে পারছে যে ফেসবুকে অনেক সময় খারাপ জিনিস বেশি থাকে। এই কারণে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ছয় লক্ষ একাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের দাবি, ফেসবুক তাদের ক্ষতি করছে। যদি তারা বুঝতে পারে, যারা বস্তুবাদি, তাহলে আমরা তো ধর্মপ্রাণ, আমাদের দ্রুত বুঝে যাওয়া উচিত। তবে তবলীগের জন্য ফেসবুক ব্যবহার করতে হলে আলইসলাম-এর ফেসবুক ব্যবহার কর।

এরপর হুযুর আনোয়ার সেই সব ওয়াকফীনে নও ছাত্রদের পুরস্কার প্রদান করেন যারা নিজের নিজের বয়সের ওয়াকফে নও পাঠ্যক্রম পূর্ণ করেছিল, এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল।

এরপর ওয়াকফাতে নওদের সঙ্গে ক্লাস আরম্ভ হয়। এই ক্লাসে ১২-১৫ বছরের মেয়েরা অংশগ্রহণ করেছিল, যাদের সংখ্যা ছিল ৩০০জন। এই ক্লাসের আলোচ্য বিষয় ছিল দোয়া।

কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর এর অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়।

এরপর খাদীজা মাসউদ আঁ হযরত (সা.)-এর হাদীস উপস্থাপন করে যা নিম্নরূপ।

হযরত সালমান ফারসি (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ বড়ই লজ্জাশীল, দয়ালু ও বদান্যশীল। বান্দা যখন তাঁর সমীপে দুই হাত তোলে, তখন তিনি তাকে শূন্যহাতে ও বিফলে ফেরত পাঠাতে লজ্জাবোধ করেন। অর্থাৎ সত্য অন্তঃকরণে কৃত দোয়া তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না, গ্রহণ করেন।

(তিরমিযি, কিতাবুদ দাওয়াত)

এরপর মানাহিল নাসীম হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

"স্মরণ রেখো! কোন ব্যক্তি কখনও দোয়া থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অসীম ধৈর্য ধারণ করে এবং অবিচলতার সাথে দোয়া করে। এবং সে আল্লাহ্ তা'লার বিষয়ে যেন অসৎ ধারণা পোষণ না করে, তাঁকে সকল শক্তি এবং ইচ্ছার আধার মনে করে। তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তারপর ধৈর্যের সাথে দোয়া করতে থাকে। ফলে এমন এক সময় আসবে হবে যখন আল্লাহ্ তার দোয়াসমূহ শুনবেন এবং তাকে উত্তর দিবেন। যারা এই পন্থা অবলম্বন করে, তারা কখনও বঞ্চিত ও হতভাগ্য হতে পারে না, নিশ্চয় তারা নিজেদের উদ্দেশ্যে সফল হয়।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০০৩)

তিনি আরও বলেন- 'আল্লাহ্ তা'লা দোয়া গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমাদের আশা-আশঙ্কা ও কামনা বাসনার অধীন নন। দেখ, শিশুরা কতটা তাদের মায়ের কাছে প্রিয় হয়ে থাকে। মা চায় শিশু যেন কোন প্রকার কষ্ট না পায়। কিন্তু শিশু যদি অনর্থক গোঁ ধরে আর কেঁদে কেঁদে ধারালো ছুরি বা জ্বলন্ত কয়লা চায়, তবে মা অকৃত্রিম ভালবাসা ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও কখনও কি চাইবে যে তার শিশু জ্বলন্ত কয়লায় হাত পোড়াক বা ধারালো চাকুতে হাত রেখে হাত কাটুক? কখনওই নয়। এই নীতি দ্বারাই দোয়া কবুল হওয়ার নীতি বোঝা যেতে পারে। এ বিষয়ে আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা আছে, যখন দোয়ার মধ্যে কোন ক্ষতিকর অংশ থাকে, তখন সেই দোয়া কোনমতেই কবুল হয় না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ) বলেন, 'যদি কোন আহমদীর হৃদয়ে খিলাফতের আসনের প্রতি সম্মান না থাকে, খিলাফতের প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগের সম্পর্ক না থাকে, শুধু প্রয়োজনের সময় দোয়ার আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়, তবে তার দোয়ার কবুল করা হবে না। অর্থাৎ যুগ খলীফার দোয়া তার সপক্ষে গৃহীত হবে না। তার সপক্ষেই দোয়া গৃহীত হবে যে বিশেষ নিষ্ঠার সাথে দোয়ার জন্য লেখে আর তার কর্মপন্থা প্রমাণ করে যে সে সব সময় তার সেই অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, যে পুণ্যকর্ম আপনি আমাকে করার নির্দেশ দিবেন, আমি তা পালন করব। এমন অনুগত বান্দার জন্য অনেক সময় আমি এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছি, একবার নয় বেশ কয়েকবার এমন দৃশ্য দেখেছি যে সেখানে দোয়া পোঁছয় নি অথচ দোয়া কবুল হয়ে গিয়েছে। দোয়ার আবেদন তখনও লেখা হচ্ছে, সেই সময় তার উপর আল্লাহ্র স্নেহদৃষ্টি পড়েছে আর সেই দোয়া তখনই কবুল হচ্ছিল। অনেক সময় দোয়া তৈরীই হয় নি, অথচ সেই দোয়া কবুল হয়ে যায়। তাই এটি এমন একটি মূল নীতি যা প্রত্যেক আহমদীকে সব সময় দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। যদি কেউ হযরত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করে এবং তাঁর সঙ্গে অনুরাগের সম্পর্ক থাকে,তবে আঁ হযরত (সা.)-এর সকল দোয়া চিরকালের জন্য এমন অনুসারীর জন্য শোনা হবে। আর যদি সে খিলাফতের সঙ্গে এমন সম্পর্ক রাখে এবং পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে নিজের অঙ্গীকার রক্ষা করে আর আনুগত্য করার চেষ্টা করে, তবে তার জন্যও দোয়া শোনা হবে, অনুচ্চারিত দোয়াও শোনা হবে। তার অন্তরের অবস্থা-ই দোয়া হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

(খুতবা জুমা, ১৬ই জুলাই, ১৯৮২)

হুকুকুল ইবাদ:

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) দোয়া কবুল হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ রহস্য বর্ণনা করে বলেন,'আল্লাহ্ তা'লার বান্দার প্রতি কেউ যদি দয়া ও অনুগ্রহ করে, তবে আল্লাহ্ও তার প্রতি দয়া করেন। তাই দোয়া গৃহীত হওয়ার এটিও একটি পন্থা। দোয়া করার জন্য এমন কোন ব্যক্তি সন্ধান করা উচিত যে কি না কোন দুঃখ ও কষ্টে আছে। সেই কষ্ট শারিরিক হোক বা আর্থিক বা সম্মানের, যে কোনও প্রকারের হতে পারে। চেষ্টা কর যেন সেই কষ্ট দূর হয়। কষ্ট দূর হোক বা না হোক, তার দায়িত্ব তোমার নয়, কিন্তু তোমার উৎসাহ ও চেষ্টা মত শক্তি প্রয়োগ কর। এরপর খোদা তা'লার নিকট নিজের উদ্দেশ্য পুরণের জন্য দোয়া কর। এই

(এরপর ৫ পাতায়..)

জুমআর খুতবা

‘এ্যায় দিল তু নিয খাতেরে ঈঁনা নিগাহ্‌দার কাখর কুনান্দ দাওয়ায়ে হুব্বে পয়াম্বারাম’

সাধারণ জনগণ হয়ত জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে মনে করে যে, আহমদীরা হয়ত বাস্তবেই মহানবী (সা.)-এর অবমাননা করছে

আমরা সবসময় দেখেছি, তাদের মধ্য হতেই এমন লোক সামনে আসে যারা (মসীহ্ মওউদকে) ভালোবাসে আর ভবিষ্যতেও এমন লোক সামনে আসতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

তাদের বিরোধিতার কারণ হলো, তারা মনে করে আমরা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিরোধী। (তাদের) এই বিরোধিতা কিছু ভুল বোঝাবুঝির ফলাফল।

তুমি পুরো জগৎকে কয়েকদিনের জন্য প্রতারিত করতে পার বা তুমি কতিপয় লোককে স্থায়ীভাবে প্রতারিত করতে পার। কিন্তু তুমি পুরো পৃথিবীকে স্থায়ীভাবে ধোকা দিতে পারবে না; আর এটিই সত্য। সত্য ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে সামনে চলে আসে।

অতএব আমাদের কাজ হলো দোয়া করা আর ধৈর্য ধারণ করা। এটিই সর্বোত্তম মাধ্যম, যা ইনশাআল্লাহ্ তা’লা আমাদের সফল করবে। আমাদের কাজ হলো, এক মুসলমানের জন্য নিজ মন আর আবেগ-অনুভূতিকে কলুষমুক্ত রাখা, তাদের জন্য দোয়া করা, যেন আল্লাহ্ তা’লা দ্রুত তাদের চোখ খুলেন আর তারা যুগ ইমামকে মানতে ও চিনতে পারে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ১৪ মে, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (১৪ হিজরত, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা’উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একজন মৌলভী সাহেব বলেছেন যে, পৃথিবীর সর্বত্র চলমান যুদ্ধ-বিগ্রহ ও নৈরাজ্যের জন্য কাদিয়ানীরা দায়ী; বরং ফিলিস্তিনে দাঙ্গা -হাঙ্গামার দায়ভারও তিনি কাদিয়ানীদের তথা আহমদীদের ওপর চাপাচ্ছিলেন। এরপর তাদের রীতি অনুসারে বলছিলেন, যা তারা সচরাচর বলে থাকে যে, আহমদীদের সাথে হেন করা তেন করা, আর তাদেরকে হত্যা করা, তাদেরকে প্রহার করা সবকিছুই বৈধ। যাহোক, এটি হলো তাদের রীতি আর এগুলো হলো তাদের বক্তব্য। যারা ‘আইম্মাতুল কুফর’ (অর্থাৎ অস্বীকারের হোতা বা অস্বীকারকারীদের নেতা) বলে আখ্যায়িত, আহমদীয়াতের সূচনা থেকেই তারা এসব কথা বলে আসছে। আমরা খোদার প্রতি লাখ লাখ কৃতজ্ঞতা জানাই যে, আমরা সেই মসীহ্ ও মাহদীর অনুসারী- যিনি আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, তাদের এসব অপলাপ শুনে বা মর্মযাতনামূলক কথাবার্তা শুনে, আর শুধু তা-ই নয়, বরং তাদের ব্যবহারিক অপচেষ্টা দেখে ও সেগুলোর মুখোমুখি হয়ে তোমরা দোয়া ও ধৈর্য প্রদর্শন করবে। তারা ‘আইম্মাতুল কুফর’ যারা আহমদীয়া জামা’ত সম্পর্কে অপপ্রচার করে নিরীহ মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। সাধারণ জনগণ হয়ত জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে মনে করে যে, আহমদীরা হয়ত বাস্তবেই মহানবী (সা.)-এর অবমাননা করছে, নাউযুবিল্লাহ্; তাই অবশ্যই তাদের সাথে এরূপ ব্যবহার করা উচিত, মৌলভীরা যা বলে তা সত্য বলে। এটি হলো, সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা। কিন্তু যারা জ্ঞানী মৌলভী আর সত্যিকার অর্থেই জানে যে, তারা যা কিছু বলে এর কোন বস্তুনিষ্ঠ ভিত্তি নেই আর তারা শুধুমাত্র নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করে , যাতে তাদের গদি ঠিক থাকে আর তাদেরকে যেন কেউ তাদের পদ থেকে অপসারণ না করে, আল্লাহ্ তা’লা তাদের সাথে কী ব্যবহার করবেন তা আল্লাহ্ তা’লাই ভালো জানেন। যেমনটি আমি বলেছি, আমাদের কাজ হলো, দোয়া করা। ঈদের খুতবায়ও যেমনটি আমি বলেছিলাম, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, ‘শত্রুর জন্যও দোয়া কর’।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৬)

আমরা তো প্রার্থনাকারী আর প্রার্থনা করি এবং করতে থাকব। এই বিরোধিতা কোন নতুন বিষয় নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ থেকেই এর সূচনা হয়েছে। তাঁর ওপরও আক্রমণ করা হতো। তাঁর কথা শোনার জন্য আগতদের ওপরও আক্রমণ করা হতো। যারা শুধু শুনার জন্য জলসায় আসে, অর্থাৎ এ মানসে আসে যে, দেখি কি বলে; তারা গ্রহণও করবে- তা আবশ্যক নয়। কিন্তু মৌলভীদের ভয় হতো যে, মির্যা সাহেবের বা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা শুনলে এরা বয়আত করে ফেলবে। তারা (অর্থাৎ মৌলভীরা) জানত যে, সত্য তাঁরই সাথে আছে, তাই (মানুষকে তাঁর কাছে) যেতে বাধা দিত, তাদের ওপর আক্রমণ করত। অর্থাৎ শুধুই বাধাই দিত না বরং আক্রমণও করত। কিন্তু যারা বাধা প্রদান করত আর এভাবে কঠোর আচরণ করত, এত কিছুর পরও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদের জন্য দোয়াই করেছেন। এটি দোয়ারই ফলাফল যে, তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ এমনও আছেন যারা বিরোধিতা সত্ত্বেও জামা’তভুক্ত হয়েছেন আর এখনও হচ্ছেন। কাজেই, মৌলভীদের এসব অপলাপ সত্ত্বেও আমরা কোন বাজে কথা বলা বা তাদের মতো কদর্য ভাষা ব্যবহার করতে পারি না। এতদসত্ত্বেও আমরা দোয়া-ই করতে থাকব আর যেমনটি আমরা সবসময় দেখেছি, তাদের মধ্য হতেই এমন লোক সামনে আসে যারা (মসীহ্ মওউদকে) ভালোবাসে আর ভবিষ্যতেও এমন লোক সামনে আসতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। তাদের কটুবাক্য শোনার পরও আমরা তাদের সাধারণ জনতা এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য দোয়া করে থাকি। তাদের দুঃখ-কষ্টে আমরা ব্যথিত হই, আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা-ই এর কারণ। আর আল্লাহ্ তা’লাও তাঁকে এই নির্দেশই দিয়েছেন যে, তাদের এসব অন্যায় ভুল বুঝা-বুঝি ও মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার কারণেই, যার দাবি তারা করে। আমল করুক বা না করুক, (ভালোবাসার) দাবি তারা অবশ্যই করে থাকে। তাই তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করবে না।

এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, আমি বালক ছিলাম, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লাহোরে একটি

নিমন্ত্রণ থেকে ফিরে আসছিলেন। তিনি যখন বাজার অতিক্রম করছিলেন তখন মানুষ (বাড়ির) ছাদে দাঁড়িয়ে তাঁকে গালিগালাজ করছিল আর বলছিল, 'মির্যা পালিয়ে গেছে, মির্যা পালিয়ে গেছে'। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, (পুরো ঘটনা) আমার মনে পড়ছে না- সম্ভবত কোন জলসায় বক্তৃতার সময় বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, তাই (তিনি) সেখান থেকে ফিরে আসছিলেন। যাহোক তিনি বলেন, এরই মাঝে আমি দেখি একজন বৃদ্ধ যার এক হাত কাটা ছিল, আর তাজা হলদি লাগানো ছিল, মনে হচ্ছিল হাত কাটার কয়েক দিনই মাত্র অতিবাহিত হয়ে থাকবে। আমি দেখি যে, সেই বৃদ্ধও তার ভালো হাতটি কাটা হাতের ওপর চাপড়াচ্ছিল আর পাঞ্জাবী ভাষায় বলছিল, 'মির্যা নঠ গেয়া, মির্যা নঠ গেয়া' (অর্থাৎ, মির্যা পালিয়ে যাচ্ছে, মির্যা পালিয়ে যাচ্ছে)। তিনি (রা.) বলেন, আমি সে সময় অল্পবয়স্ক হওয়ার কারণে বিস্মিত হতাম যে, এরা কেন বলছে, মির্যা পালাচ্ছে। এমন কী ঘটনা ঘটলো। আমি তো তেমন কিছু বুঝতে পারিনি। এর কারণ শুধুমাত্র বিরোধিতা ছিল অথবা মৌলভীরা মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল, তারা যাচ্ছেতাই বলতো, বিষয় জানুক বা না জানুক, যা মুখে আসছিল তা-ই বলছিল।

অনুরূপভাবে {তিনি (রা.)} আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার লাহোর শহরের (কোন রাস্তা দিয়ে) যাচ্ছিলেন। তখন পেছন থেকে কেউ (তাঁর ওপর) আক্রমণ করে আর তিনি পড়ে যান। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, (তিনি) হোঁচট খান, কিন্তু পড়ে যান নি।

[সীরাত হযরত মসীহ মওউদ (আ.), প্রণেতা-ইয়াকুব আলি ইরফানি, পৃ: ৪৪২]

একইভাবে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমরা মানুষকে তাঁর ওপর পাথর ছুঁড়তেও দেখেছি।

মোটকথা, সে সময় বিরোধিতা তুঙ্গে ছিল আর স্বভাবতই জামা'তের কোন কোন বন্ধুরও রাগ হতো যে, অকারণে এরা কেন এমন করছে? তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি এলহাম হয়। যদিও এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে এই এলহাম অন্য কোন রেওয়ায়েতে পাওয়া যায় নি। কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছেন যে, এটি এলহাম ছিল। যাহোক, এতে সন্দেহ নেই যে, এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি পঙ্‌ক্তি। আর তা হলো,

(উচ্চারণ: 'এ্যায় দিল তু নিয খাতেরে ঈনাঁ নিগাহ্‌দার- কাখর কুনান্দ দাওয়ায়ে হুব্বে পয়াম্বারাম') অর্থাৎ, হে আমাদের প্রত্যাদিষ্ট! এসব মুসলমান, তোমাকে গালমন্দ করে, (যদি এটি এলহাম হয়ে থাকে তাহলে একথা আল্লাহ্ তা'লা বলছেন,) তুমি তাদের কিছু বলো না।

(ইযালায়ে আওহাম, ১ম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮২)

এরা তোমাকে কেন গালমন্দ করে, কেন মারতে চায় আর তোমার ওপর কেন হামলা করে? এরা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি (ভালোবাসার) কারণেই তোমাকে মারে ও গালি দেয়; তাই তাদের প্রতি খেয়াল রাখা একান্ত আবশ্যক। যে ভালোবাসার কারণে এরা মারছে, অর্থাৎ যে কারণে (তোমাকে) মারছে তা হলো, মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা, যিনি আল্লাহ্ তা'লার অনেক প্রিয়ভাজন। তাই ভুল বুঝার কারণে হোক বা যে কারণেই হোক না কেন, তুমি তাদের প্রতি খেয়াল রেখো, অভিশাপ দেবে না।

মোটকথা, আমাদের যে বিরোধিতা হয় এর মূল কারণ কী- তা আমাদের (খতিয়ে) দেখা উচিত। এরা যারা আমাদের গালিগালাজ করে আর বলে যে, আমাদের 'চা' মদের চেয়েও নিকৃষ্ট। আর মদ পান করা বৈধ হতে পারে, কিন্তু আহমদীদের (বাড়িতে) চা পান করাও বৈধ নয়, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তারা যদি জানতে পারে যে, আমার হৃদয়ে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার যে অনল জ্বলছে তা তাদের লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়েও নেই, তাহলে তারা তৎক্ষণাৎ তোমাদের অর্থাৎ আহমদীদের পায়ে লুটিয়ে পড়বে। তাদের বিরোধিতার কারণ হলো, তারা মনে করে আমরা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিরোধী। (তাদের) এই বিরোধিতা কিছু ভুল বোঝাবুঝির ফলাফল।

এই বিষয়টি উল্লেখ করার পর তিনি (রা.) এটিও বলেন যে, মানুষ যদি বিরোধিতা করে আর আমাকে বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অথবা তোমাদের গালমন্দ করে, তাহলে জামা'তের স্মরণ রাখা উচিত যে, তারা তোমাদেরই ভাই এবং কোন ভুল বুঝাবুঝির শিকার। অতএব তোমরা অসন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে দোয়া কর আর এই বিরোধীদেরকে প্রকৃত বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত কর। তোমরা যখন তাদেরকে প্রকৃত বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত করবে তখন তারা জানতে পারবে যে, আমরা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শত্রু নই বরং তাঁর সত্যিকার প্রেমিক। তখন সেসব লোক, যারা আমাদের মারতে উদ্যত, আমাদের জন্য মরতেও প্রস্তুত হয়ে যাবে।

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২২, পৃ: ৮৪-৮৬)

যাহোক, আমাদের বিরোধীদের জন্য আমাদের দোয়া করা উচিত। যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের এটিই শিখিয়েছেন যে, দোয়া কর। তাদেরই মাঝ থেকে বিন্দু বিন্দু ভালোবাসা টপকে পড়ে আর তাদেরই মাঝ থেকে মানুষ ঈমান আনয়ন করবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে এক স্থানে বলেন, হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব বলতেন যে, আমি 'চোবারা' অর্থাৎ ওপরের তলায় থাকতাম আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বাড়ির নীচের তলায় থাকতেন। এক রাতে নীচের অংশ থেকে আমি এমন কান্নার শব্দ শুনতে পাই যেমনটি কোন নারী প্রসব বেদনার সময় চিৎকার করে থাকে। আমি আশ্চর্য হই এবং কান পেতে সেই আওয়াজ শুনলে বুঝতে পারি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দোয়া করছিলেন। আর তিনি বলছিলেন, হে খোদা! প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে, মানুষ এ কারণে মারা যাচ্ছে। হে খোদা! যদি এরা সবাই মারা যায় তাহলে তোমার ওপর কে ঈমান আনবে? এই ঘটনাটি অন্যত্রও উদ্ধৃত হয়েছে, ঘটনা যদিও একই, কিন্তু সেখানে উদ্ধৃতি হলো, তিনি পাশের কক্ষে ছিলেন আর দরজা দিয়ে আওয়াজ আসছিল। যাহোক ঘটনা এটিই বর্ণিত হয়েছে যা তিনি (এখানে) বর্ণনা করছেন। তিনি (আ.) দোয়া করছিলেন যে, এরা যদি মারা যায় তাহলে তোমার প্রতি কে ঈমান আনবে। এখন দেখুন! প্লেগ সেই নিদর্শন ছিল যার সংবাদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) দিয়েছিলেন। প্লেগের নিদর্শনের কথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী থেকেও জানা যায়। কিন্তু যখন সেই প্লেগ এসেছে তখন সেই একই ব্যক্তি, যার সত্যতা প্রকাশের জন্য তা দেখা দেয়, খোদা তা'লার সামনে কাকুতিমিনতি করেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্! যদি তারা মারা যায় তাহলে তোমার প্রতি ঈমান কে আনবে। অতএব মু'মিনের জনসাধারণের জন্য বদদোয়া করা উচিত নয়, কেননা সে তাদেরকে রক্ষার জন্যই দণ্ডায়মান হয়। সাধারণ জনগণকে রক্ষা করাই এক মু'মিনের কাজ। যদি সে তাদের অভিশাপ দেয় তাহলে রক্ষা করবে কাকে? তাহলে তো তারা সবাই মারা যাবে, যদি সেই দোয়া কবুল হয়ে যায়।

আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠিতই হয়েছে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য। আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য, মানুষের মাহাত্ম্য তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। অতএব যাদেরকে উন্নত মানে পৌঁছানোর জন্য আমাদেরকে দাঁড় করানো হয়েছে, আমরা তাদের অভিশাপ কীভাবে দিতে পারি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তোমাদের চেয়ে খোদা তা'লা অধিক আত্মাভিমান রাখেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে খোদা তা'লা নিজ এলহামে বলেছেন,

(উচ্চারণ: 'এ্যায় দিল তু নিয খাতেরে ঈনাঁ নিগাহ্‌দার- কাখর কুনান্দ দাওয়ায়ে হুব্বে পয়াম্বারাম') এতে খোদা তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়কে সম্বোধন করে তারই মুখ দিয়ে উচ্চারণ করাচ্ছেন। এটি সম্ভবত ভেরায় বক্তৃতা করার সময় তিনি বলেছিলেন। অন্য একটি ঘটনায় পুনরায় উক্ত পঙক্তি উল্লেখ করেন। পূর্বের ঘটনা ভিন্ন ছিল। সেটি লাহোরের (ঘটনা) ছিল আর এটি ভেরা'র। তিনি বলেন, খোদা তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর হৃদয়কে সম্বোধন করে তার মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন যে, হে আমার হৃদয়! তুমি তাদের ধ্যানধারণা ও আবেগ-অনুভূতির প্রতি খেয়াল রাখ, যেন তাদের হৃদয় কলুষিত না হয়। এমন যেন না হয় যে, তুমি বিরক্ত হয়ে অভিশাপ দেওয়া আরম্ভ কর। তারা আসলে তোমার রসূলকে ভালোবাসে, আর সেই ভালোবাসার কারণেই, তারা তোমাকে গালি দেয়। অর্থাৎ, তারা যে তোমাকে গালি দেয়, তার কারণ হলো রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে তারা ভালোবাসে। এটিই প্রকৃত বিষয়। আমরা জানি যে, আমাদের বিরোধীদের মধ্য থেকে একটি অংশ অন্যায্য বিরোধিতা করছে। কিন্তু একটি অংশ কেবল তাদের জালে ফেঁসে আছে। আর পাকিস্তানে বা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অধিকাংশ মানুষই তাদের জালে ফেঁসে আছে। তাই তারা

আমাদের বিরোধিতা করে। অর্থাৎ তাদের বিরোধিতার কারণ হলো আমাদের প্রিয় নবীর প্রতি ভালোবাসা। যখন তাদের কাছে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আমরা মহানবী (সা.)-কে ভালোবাসি, তখন তারা বলবে, এরা মহানবী (সা.)-এর সম্মান প্রতিষ্ঠাকারী, তাই তাদের সাহায্য কর। সেই দিন অবশ্যই আসবে, ইনশাআল্লাহ্। ভুল বোঝাবুঝি কতদিন চলতে পারে!

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এক ইংরেজ লেখক লিখেছেন যে, তুমি পুরো জগৎকে কয়েকদিনের জন্য প্রতারিত করতে পার বা তুমি কতিপয় লোককে স্থায়ীভাবে প্রতারিত করতে পার। অর্থাৎ পু রো পৃথিবীকে মাত্র কয়েক দিনের জন্য ধোকা দিতে পার, আর কিছু লোককে হয়ত স্থায়ীভাবে ধোকা দিতে পার; একান্ত সঠিক কথা। কিন্তু তুমি পুরো পৃথিবীকে স্থায়ীভাবে ধোকা দিতে পারবে না; আর এটিই সত্য। সত্য ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে সামনে চলে আসে। এখন আমরা এটিই দেখি যে, যারা মানুষের কারণে প্রতারিত হয়েছে, মানুষের কথায় কান দিয়েছে, অবশেষে তাদেরই মাঝ থেকে আহমদী হচ্ছে। আহমদীয়া জামা'তের সংখ্যা যে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা কোথা থেকে বৃদ্ধি পাচ্ছে? তাদেরই মাধ্যমে বৃদ্ধি পাচ্ছে যারা পূর্বে বিরোধীদের সাথে ছিল।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-৩৩, পৃ: ২২১-২২৩)

অতএব এই বিরোধিতাও ইনশাআল্লাহ্ একদিন শেষ হয়ে যাবে। তাদেরই মধ্য থেকে মানুষ এসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আত করবে। বহু লোক আমাকেও লিখে থাকে, আজকালও লিখে থাকে যে, বিরোধিতার পর যখন আমাদের বলা হয় যে, দোয়া কর বা বই -পুস্তক পাঠ কর, আমরা যখন তা করলাম তখন আমাদের কাছে বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যায়। আর এখন আমরা বয়আত করতে চাই এবং বয়আত করে জামা'তভুক্ত হচ্ছি। এমনটি সর্বদাই হয়ে আসছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও এ সম্পর্কে লিখেছেন, অন্যান্য খলীফারাও লিখেছেন যে, বহু লোক এভাবে চিঠিপত্রে লিখত, আর আজও তা-ই হচ্ছে।

অতএব এই মৌলভীরা আমাদের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়ে, এর মাধ্যমে আজকাল আহমদীয়াতের বার্তা যতটা পৌঁছাচ্ছে, বিশেষ করে সেই শ্রেণীর কাছে, যাদের কাছে আমাদের পক্ষ থেকে বার্তা পৌঁছানো কঠিন ছিল, (এভাবে তারা) আমাদেরই কাজ করছে আর এর ফলে আমাদেরই উপকার হচ্ছে। দোয়া তো আমরা তাদের জন্যও করি যে, তাদের মাঝে যদি বিন্দুমাত্র সততাও থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিবেকবুদ্ধি দিন আর তারা যেন বুঝতে পারে। কিন্তু জনসাধারণের জন্য, সাধারণ মুসলমানদের জন্য বেশি দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে তাদের থাবা থেকে মুক্ত করেন।

যাহোক তাদের বিরোধিতা আমাদেরই উপকার করছে। এমন সব স্থানে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে যেখানে পূর্বে পৌঁছত না, অথবা আমাদের মাধ্যমে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ নিজে থেকেই আমাদের সাথে যোগাযোগও করে। অতএব আমাদের কাজ হলো দোয়া করা আর ধৈর্য ধারণ করা। এটিই সর্বোত্তম মাধ্যম, যা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আমাদের সফল করবে। আমাদের কাজ হলো, এক মুসলমানের জন্য নিজ মন আর আবেগ-অনুভূতিকে কলুষমুক্ত রাখা, তাদের জন্য দোয়া করা, যেন আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত তাদের চোখ খুলেন আর তারা যুগ ইমামকে মানতে ও চিনতে পারে।

****

২ এর পাতার পর.....

পদ্ধতিতে করা দোয়া দ্রুত কবুল হবে।

তোমরা খোদা তা'লার কোন বান্দার কষ্ট দূর করার জন্য যত বেশি মনোযোগি হবে, খোদা তা'লা তোমাদের কষ্ট দূর করার জন্য তার থেকে বেশি মনোযোগি হবেন।

(খুতবা জুমা, ২৮ শে জুলাই, ১৯১৬)

হযরত খলীফাতুল মসীহ বলেন, 'বস্তুত যারা খোদার বান্দাদের সাহায্য করে, দোয়া না করলেও, আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে থাকেন আর যারা নিজ ভাই ও নিকটাত্মীয়দের অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন থাকে, যদিও তারা তাদের কোন আর্থিক ক্ষতি করে না, তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে না, কিন্তু নিজের দুঃখ-কষ্টকেই কেবল নিজের মনে করে, আত্মীয় স্বজনদের দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে উদাসীন থাকে, আশপাশে বসবাসকারীদের সম্পর্কে চিন্তিত থাকে না, তাদের দোয়া ঠিক ততটাই দুর্বল হয়ে যায়। কাজেই দোয়া কবুল হওয়ার গভীর রহস্য এটিই যে, যে-ব্যক্তি বান্দাদের উপর রহম করে না, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি রহম করেন না, তার দোয়া গ্রহণ করেন না।"

পবিত্রতা:

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন:

'দোয়া কবুল হওয়ার জন্য একথাও স্মরণ রেখো যে, দোয়া করার পূর্বে নিজের পরিধান ও দেহকে পরিচ্ছন্ন কর। যদিও প্রত্যেক প্রার্থনাকারী এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু যারা অনুভব করে বা করতে পারে, তাদের অভিজ্ঞতা আছে যে, মানুষ যখন দোয়া করে, তখন সে খোদা তা'লার এক নৈকট্য লাভ করে, তার আত্মা আল্লাহ্র দিকে আকৃষ্ট হয়। যেহেতু আত্মার পবিত্রতা দেহের পবিত্রতার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, আর আত্মার অপবিত্রতা দেহের অপবিত্রতার সঙ্গে, তাই শরীর যদি অপবিত্র হয় তবে আত্মার উপরও সেই অপবিত্রতার প্রভাব পড়ে। যদি দেহ পবিত্র হয়, তবে আত্মার উপরও এর পবিত্র প্রভাবই পড়ে। এই কারণেই ইসলাম সকল প্রকার ইবাদতের জন্য পরিচ্ছন্নতার শর্তকে অনিবার্য করেছে। সুফিরা দোয়া করার জন্য পৃথক পৃথক পরিধান তৈরী করে রাখে, যেগুলিকে তারা ভীষণ পরিস্কার রাখে এবং সসুগন্ধি লাগায়। তাই দোয়া কবুল হওয়ার এটিও একটি পন্থা- দোয়া করার পূর্বে মানুষ যেন নিজের কাপড় পরিস্কার করে। এভাবে করা দোয়া বেশি কবুল হয়।

(খুতবা জুমা, ২৮ শে জুলাই. ১৯১৬)

ধৈর্য এবং ক্ষমাপ্রার্থনা:

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) বলেন:

আমরা যখন নবী করীম (সা.)-এর জীবনের উপর দৃষ্টি দিই, তখন জানতে পারি যে, তাঁর চলাফেরা, ওঠাবসা, খাওয়া-দাওয়া, নামায পড়া, বাজার যাওয়া, কথা বলা-সব কিছু দোয়া দিয়েই শুরু হয়। অতএব স্মরণ রেখো, এই দোয়াই অস্থির চিত্তের প্রশান্তির কারণ এবং দুর্বল প্রকৃতির মানুষদের সাহস জোগায়। দোয়ার পাশাপাশি খোদা তা'লা ধৈর্যেরও শিক্ষা দিয়েছেন, কেননা অনেক সময় ঐশী প্রজ্ঞার কারণে যখন দোয়া কবুল হতে বিলম্ব হয়, তখন মানুষ আল্লাহ্র সম্পর্কে মন্দ চিন্তাধারা মাথায় আনতে শুরু করে এবং দোয়া সম্পর্কেই সে নানান প্রকার সন্দেহে নিপতিত হয়। এই জন্য অবিচলতা অবলম্বন করা এবং আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা উচিত।

তিনি আরও বলেন-

'দোয়া, ইসতেগফার এবং লা-হাওলা' দোয়া পাঠ কর। পবিত্র লোকদের সহচার্যে থাক। আত্মসংশোধনের চিন্তায় অস্থির হয়ে লেগে থাক, কেননা অস্থির হলে খোদা তা'লা কৃপা করেন আর দোয়া কবুল করেন।

(খুতবা ঈদুল ফিতর, ৯ ডিসেম্বর, ১৯০৪)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন,

" প্রতিবারই আমরা যখন পরীক্ষা ও বিপদাপদের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়ে আল্লাহ্র সমীপে নতজানু হয়ে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, তখন আমাদের সামনে উন্নতির নতুন নতুন পথ খুলে যেতে থাকে। মানুষের অত্যাচার ও নিপীড়ন সহন করার, প্রাণ, সম্পদ, সময় ও সম্মানের মোকাবিলায় ধৈর্য প্রদর্শন এবং খোদা তা'লার সামনে নতজানু হওয়ার পরিণামে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে পুরস্কার পাওয়ার এবং বিজয় লাভ করার ঐশী প্রতিশ্রুতি আমাদের সঙ্গে আছে, যা লাভ করার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হল দোয়া। যদি প্রত্যেক আহমদী খোদা তা'লার মুখাপেক্ষী হওয়ার তাৎপর্য অনুধাবন করে তা নিজেদের কর্মযোগে বাস্তবায়িত করতে শুরু করে দেয়, তবে যেখানে যেখানে আহমদীদের উপর নিপীড়ন চলছে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এবং দোয়ার মাধ্যমেই সেগুলি সব বাতাসে ভেসে যাবে।" ইনশাআল্লাহ্॥ (ক্রমশ.....)

যুগ খলীফার বাণী

পরকালের বিষয়ে চিন্তিত এবং আল্লাহ্র ভয়ে ভীত ব্যক্তি সর্বপ্রথম নিজের ইবাদতের হিফাযতের বিষয়ে মনোযোগী হয়।

(খুতবা জুমা, ৪ঠা অক্টোব, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

জুমআর খুতবা

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি এই কলেমা পড়ে নেয় আমাকে এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। "

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ ফারুক আযাম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বদর, ওহদ ও খন্দক সহ সমস্ত যুদ্ধে রসুল করীম (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। বারোজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব যারা হলেন-

মাননীয় কুরায়েশী মহম্মদ ফযলুল্লাহ সাহেব (নায়েব নাযের ইশাআত, কাদিয়ান), মাননীয় সৈয়্যদ বশীরুদ্দীন আহমদ সাহেব (মুবাল্লিগ সিলসিলা কাদিয়ান), মাননীয় বাশারত আহমদ হায়দার সাহেব ওয়াকফে জিন্দগী কাদিয়ান, মাননীয় ডক্টর মহম্মদ আলি খানি সাহেব (আমীর জামাত আহমদীয়া পেশোয়ার জেলা), মাননীয় রফি খান শাহযাদা সাহেব (সাবেক সদর মহল্লা দারুর রহমত পূর্ব রাজেকী রাবোয়া), মাননীয় আয়ায ইউনুস সাহেব (অস্ট্রেলিয়া), মাননীয় মিঞা তাহের আহমদ সাহেব (ওকালত মাল-এর সাবেক কর্মী), মাননীয় রফিক আফতাব সাহেব (যুক্তরাজ্য), মাননীয়া জারিনা আখতার সাহেব (যুক্তরাজ্যের জামেয়ার শিক্ষক মির্যা নাসীর আহমদ সাহেবের সহধর্মিনী), মাননীয় হাফিয মহম্মদ আকরম সাহেব, মাননীয় চৌধুরী নুর আহমদ নাসের সাহেব, এবং মাননীয় মাহমুদ আহমদ মিনহাস সাহেব (হাকীম উবাইদুল্লাহ্ মিহনাস সাহেবের পুত্র)।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ২১ মে, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (২১ হিজরত, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত উমর (রা.) এর স্মৃতিচারণ হচ্ছিল। তিনি যেসব যুদ্ধ এবং সেনা অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন- সে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করছি। হযরত উমর বিন খাত্তাব বদর, উহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন। এছাড়া বেশ কিছু সেনা অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন, যার মাঝে কিছু সেনা অভিযানে তিনি নেতৃত্বও দিয়েছেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা,৩য় খণ্ড, পৃ: ২০৬)

বদরের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় সাহাবীদের কাছে থাকা উটের সংখ্যা ছিল ৭০। তাই একেকটি উটকে তিন জনের জন্য নির্ধারণ করা হয়। আর প্রত্যেকে পালাক্রমে আরোহন করত। হযরত আবু বকর, হযরত উমর এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) একটি উটে পালাক্রমে আরোহন করতেন।

(আসীরাতুল হালবিয়া, বাব যিকুরিল মাগাযিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০৪)

বদরের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) যখন যাত্রা করেন, সে সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে থামানোর উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে বের হন, যা সিরিয়া থেকে আসছিল। মুসলমানদের কাফেলা যখন যাফেরান পৌঁছায়, (এটি মদিনার নিকটেই সাফরা উপত্যকার নিকটবর্তী একটি উপত্যকা) তখন তিনি সংবাদ পান যে, কুরাইশরা তাদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে রক্ষার জন্য বের হয়েছে। মহানবী (সা.) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন আর তাদেরকে এই সংবাদ প্রদান করেন যে, মক্কা থেকে একটি সেনাদল অত্যন্ত দ্রুত বেগে যাত্রা করেছে- এ সম্পর্কে তোমাদের মতামত কী? তোমরা কী সেনাদলের বিপরীতে বাণিজ্যিক কাফেলাকে অধিক পছন্দ কর? তারা বলল, হ্যাঁ। অর্থাৎ এক দল বলে, আমরা শত্রুদের বিপরীতে বাণিজ্যিক কাফেলাকে অধিক পছন্দ করব। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, এক দল বলে, যদি আপনি আমাদের কাছে যুদ্ধের উল্লেখ করতেন তাহলে আমরা তার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারতাম, আমরা তো বাণিজ্যিক কাফেলার উদ্দেশ্যে বের হয়েছি। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার বাণিজ্যিক কাফেলার দিকেই যাওয়া উচিত আর আপনি শত্রুদের ছেড়ে দিন। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর পবিত্র চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে যায়। হযরত আবু আইয়ুব বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতের অবতরণের কারণও উক্ত ঘটনা - كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ, (সূরা আনফাল: ০৬) অর্থাৎ, যেভাবে তোমার প্রভু তোমাকে সত্যসহ নিজ ঘর থেকে বের করেছিলেন, অথচ মু'মিনদের একটি দল নিশ্চিতভাবে তা অপছন্দ করত। তখন হযরত আবু বকর দণ্ডায়মান হন এবং কথা বলেন আর খুব সুন্দর বক্তৃতা করেন। এরপর হযরত উমর দণ্ডায়মান হন এবং কথা বলেন আর খুব সুন্দর বক্তৃতা করেন। অতঃপর মিক্বদাদ দণ্ডায়মান হন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন সেদিকেই চলুন, আমরা আপনার সাথে আছি। খোদার কসম, আমরা আপনাকে এ কথা বলব না যেমনটি বনী ইসরাঈল জাতি মূসাকে বলেছিল যে, فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ (সূরা মায়েদা: ২৫)। অর্থাৎ তুমি এবং তোমার প্রভু গিয়ে লড়াই কর, আমরা তো এখানেই বসে থাকব। তারা বলেন, না, বরং আমরা আপনার সহযোদ্ধা হয়ে লড়াই করব, যতক্ষণ আমাদের মাঝে প্রাণ রয়েছে।

(আসীরাতুল হালবিয়া, বাব যিকরিল মাগাযিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০৫-২০৬)

হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, তারা যখন বন্দিদের ধরেন, অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন বন্দিদের ধরে, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আবু বকর এবং হযরত উমরকে বলেন, এই বন্দিদের সম্পর্কে তোমাদের মতামত কী? হযরত আবু বকর নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র নবী! তারা আমাদের চাচাতো (ভাই) এবং আত্মীয়-স্বজন। আমার মতে আপনি তাদের কাছ থেকে ফিদিয়া বা মুক্তিপণ গ্রহণ করুন, তা আমাদের জন্য সেসব কাফিরের মোকাবিলায় শক্তির কারণ হবে আর অচিরেই (হয়ত) আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ইসলামের পানে পরিচালিত করবেন। মহানবী (সা.) বলেন, হে ইবনে খাত্তাব! তোমার অভিমত কি? হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! না; আল্লাহ্‌র কসম, আবু বকরের সাথে আমি একমত নই। বরং আমার মত হলো, আপনি তাদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিন, আমরা তাদের শিরোচ্ছেদ করব। আলী (রা.)-এর হাতে আকীলকে তুলে দিন যাতে সে তার শিরোচ্ছেদ করে আর আমার হাতে অমুককে দিন {যে বংশের দিক থেকে হযরত উমর (রা.)'র আত্মীয় ছিল} যাতে আমি তার শিরোচ্ছেদ করি, কেননা এরা সবাই কাফিরদের নেতা এবং তাদের সর্দার। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর পরামর্শকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার মতামতকে গ্রহণ করেন নি। পরের দিন আমি এসে দেখি, মহানবী (সা.) এবং আবু বকর (রা.) বসে কাঁদছেন। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে বলুন কোন জিনিস আপনাকে

এবং আপনার সাথিকে কাঁদিয়েছে? (আপনার কথা শুনে) আমার কান্না পেলে আমিও কাঁদব, নতুবা আমি আপনাদের উভয়ের মতো কান্নার ভান করব। মহানবী (সা.) বলেন, আমার কান্নার কারণ হলো, তোমার সঙ্গীরা আমার সামনে তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণের যে পরামর্শ দিয়েছিল আমার কাছে তাদের শাস্তি ঐ বৃক্ষের চেয়েও বেশি নিকটে (বলে) উপস্থাপন করা হয়েছে যে বৃক্ষটি আল্লাহ্‌র নবী (সা.)-এর নিকটেই ছিল। আর আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন যে, مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗۤ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ (সূরা আল্ আনফাল: ৬৮) অর্থাৎ, কোন নবীর জন্য এটি সমীচীন নয় যে, পৃথিবীতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছাড়াই সে কাউকে বন্দি বানাবে। এরপর দু'টি আয়াত পরেই যা আছে তা হলো, فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا (সূরা আল্ আনফাল: ৭০)অর্থাৎ, অতএব তোমরা গনিমতের মালস্বরূপ যা কিছু পাও তা থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও। অতএব, আল্লাহ্ তাদের জন্য গনিমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বৈধ আখ্যা দিয়েছেন। এটি সহীহ্ মুসলিমের হাদীস।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সাইর, হাদীস-৪৫৮৮)

এই হাদীসের প্রথমদিকের বাক্যাবলী হলো, মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) কাঁদছিলেন। এরপর কুরআনের আয়াতের বাক্যাবলীতে যে বিষয় বর্ণিত হয়েছে তা এই রেওয়ায়েত বা হাদীসকে সন্দেহপূর্ণ করে দেয়, স্পষ্ট করে না আর বক্তব্য স্পষ্ট হয় না। যাহোক, এই বর্ণনাকে সঠিক জ্ঞান করে অধিকাংশ ইতিহাসগ্রন্থে ও জীবনীগ্রন্থে মুফাস্সিরগণ বর্ণনা করেছেন যে, বদরের যুদ্ধবন্দিদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণের সিদ্ধান্তে আল্লাহ্ তা'লা যেন অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন আর হযরত উমর (রা.)-এর মতামতকে পছন্দ করেছেন। হযরত উমর (রা.)-এর জীবনচরিত প্রণেতারা যখন একটি পৃথক অধ্যায় রচনা করেন যে, হযরত উমর (রা.)-এর পরামর্শের প্রেক্ষিতে কুরআনের কোন্ কোন্ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে- সেগুলোর মধ্যে এটিও একটি লিপিবদ্ধ করা হয় যে, বদরের যুদ্ধবন্দিদের সম্পর্কে হযরত উমর (রা.)-এর মতামতকে আল্লাহ্ তা'লা অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। কিন্তু এটি অস্পষ্ট বা সংশয়পূর্ণ, যেমনটি আমি বলেছি, এর মাধ্যমে (বিষয়টি) স্পষ্ট হয় না, বরং মনে হয়, জীবনীকারগণ ও তফসীরকারকগণ এটি বুঝতে ভুল করেছেন। যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ বিষয়টি যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তা তাঁর একটি অপ্রকাশিত তফসীরি নোট থেকে পাওয়া গেছে, যা এসব বর্ণনাকে অপনোদন করে আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর ব্যাখ্যাই যথার্থ মনে হয়। মনে হয়, অকারণে হযরত উমর (রা.)-এর পদমর্যাদা উঁচু করার জন্য তারা এই রেওয়ায়েত রচনা করেছে অথবা একে ভুল বুঝা হয়েছে। যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সূরা আনফালের ৬৮ নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ইসলামের পূর্বে আরবে রীতি ছিল আর তিনি লিখেন, পরিতাপের বিষয় হলো, আজও পৃথিবীর কোন কোন অংশে এই (রীতি) প্রচলিত রয়েছে যে, যুদ্ধ বা লড়াই না হলেও মানুষকে বন্দি করা হতো আর তাদেরকে দাস বানানো হতো। এই আয়াত সেই কুপ্রথাকে রহিত করে এবং সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ প্রদান করে যে, শুধুমাত্র যুদ্ধাবস্থায় এবং যুদ্ধের পরেই শত্রু পক্ষের লোকদের বন্দি করা যেতে পারে। যদি যুদ্ধ-বিগ্রহ না হয় তাহলে কাউকে বন্দি করা বৈধ নয়। এই আয়াতের বড়ই ভুল তফসীর করা হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, যখন মুসলমানরা বদরের যুদ্ধের সময় মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে কতককে বন্দি করে, তখন মহানবী (সা.) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন যে, তাদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। হযরত উমর (রা.)-এর মতামত ছিল তাদেরকে হত্যা করা উচিত। হযরত আবু বকর (রা.)-এর মতামত ছিল তাদের কাছ থেকে ফিদিয়া গ্রহণ করে ছেড়ে দেওয়া উচিত। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর পরামর্শ পছন্দ করেন। আর এটি সূরা আনফালের ৬৮ নাম্বার আয়াত, যেখানে বলা হয়েছে যে, কোন নবীর জন্য এটি বৈধ নয় যে, সে পৃথিবীতে রক্তপাত করবে।

যাহোক হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন, এখানে যে মতামত গ্রহণ করা হয়, তাতে হযরত আবু বকর (রা.)-এর মত ভিন্ন ছিল এবং হযরত উমর (রা.) এর মত ভিন্ন ছিল। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর মতামতকে পছন্দ করেন এবং ফিদিয়া নিয়ে বন্দিদেরকে ছেড়ে দেন। কিন্তু বলা হয় যে, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন যেন আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.) এর এই কাজকে অপছন্দ করেছেন। বন্দিদের হত্যা করা উচিত ছিল এবং ফিদিয়া নেওয়া ঠিক হয় নি। এটি তাবরীর তফসীরে রয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, কিন্তু এই তফসীর সঠিক নয়। প্রথমত আল্লাহ্ তা'লা সে সময় পর্যন্ত এমন কোন নির্দেশ অবতীর্ন করেননি যে বন্দিদের কাছ থেকে ফিদিয়া নিয়ে তাদেরকে যেন ছাড়া না হয়, তাই ফিদিয়া গ্রহণ করার কারণে মহানবী (সা.)-এর ওপর কোন আপত্তি আসতে পারে না। দ্বিতীয়ত এর পূর্বে মহানবী (সা.) নাখলা নামক স্থানে দুই ব্যক্তির কাছ থেকে ফিদিয়া নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ তা'লা তাঁর (সা.) এই কাজকে অপছন্দ করেননি। তৃতীয়ত এটি থেকে মাত্র দুই আয়াত পরে আল্লাহ তা'লা মুসলমানদের অনুমতি প্রদান করছেন যে, গনিমতের মাল থেকে তোমরা যা লাভ কর তা থেকে খাও, তা হালাল এবং পবিত্র। এ কথা কারো কল্পনাতেও আসতে পারে না যে, মহানবী (সা.)-এর ফিদিয়া গ্রহণ করাকে আল্লাহ তা'লা অপছন্দ করবেন আর এভাবে যে অর্থ অর্জিত হয় সেটিকে হালাল ও পবিত্র বলবেন। তাই এই তফসিরই ভুল আর সঠিক তফসির এটিই যে, এই আয়াতে একটি সাধারণ নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে, আর তা হলো, মানুষকে তখনই বন্দি করা যেতে পারে যখন রীতিমত যুদ্ধ হয় এবং কার্যকরী আক্রমণে শত্রুদের পরাজিত করা হয়।

(হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর অপ্রকাশিত দরস, সূরা আনফাল, রেজিস্টার নম্বর-৩৬, পৃ: ৯৬৮-৯৬৯)

কুরআনের তফসীর কারকদের মধ্য থেকে আল্লামা ইমাম রাযী এবং প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক আল্লামা শিবলী নু'মানী সাহেবেরও একই মতামত যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন।

(তফসীরে কবীর, আল্লামা ইমাম রাজি, ৮ম খণ্ড, ভাগ-১৫, পৃ: ১৫৮)

হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব লিখেন যে, মদিনায় পৌঁছে মহানবী (সা.) বন্দিদের বিষয়ে পরামর্শ করেন যে, তাদের সাথে কী করা উচিত। আরবে সাধারণত বন্দিদের হত্যা করার বা স্থায়ী দাস বানানোর রীতি ছিল, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর প্রকৃতির জন্য এটি খুবই কষ্টকর ছিল আর তখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন প্রকার ঐশী নির্দেশও অবতীর্ণ হয় নি। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন যে, আমার মতে তাদের কাছ থেকে ফিদিয়া নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া উচিত, কেননা তারা মূলত আমাদেরই ভাই। হতে পারে আগামীতে এদেরই মাঝে ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিদের জন্ম হবে। কিন্তু হযরত উমর (রা.) এই মতামতের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, ধর্মের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত নয় আর এরা তাদের কৃতকর্মের দরুন হত্যাযোগ্য হয়েছে। অতএব আমার মতে এদের সকলকে হত্যা করা উচিত, বরং এই আদেশ দেওয়া উচিত যে, মুসলমানরা নিজ হাতে নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করবে। মহানবী (সা.) তাঁর প্রকৃতিগত দয়ার বৈশিষ্ট্যে প্রভাবিত হয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর পরামর্শ পছন্দ করেন এবং হত্যার বিপরীতে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন এবং নির্দেশ প্রদান করেন যে, হত্যার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দিলেন এবং আদেশ দিলেন যে, যেসব মুশরিক নিজেদের ফিদিয়া ইত্যাদি প্রদান করে দিবে তাদেরকে যেন ছেড়ে দেওয়া হয় অতএব পরবর্তীতে তদনুযায়ী ঐশী আদেশও অবতীর্ণ হয়। ফিদিয়া প্রদানের বিষয়ে যখন ঐশী আদেশ অবতীর্ণ হল, যেভাবে হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.)ও লিখেছেন সেক্ষেত্রে উক্ত হাদীসকে মূল ভিত্তি বানিয়ে মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর ক্রন্দনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা অদ্ভুত বিষয় বলে মনে হয়। যাহোক, হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন, অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির সামর্থ অনুযায়ী এক হাজার দিরহাম থেকে শুরু করে চার হাজার দিরহাম পর্যন্ত তার ফিদিয়া নির্ধারণ করে দেওয়া হয় আর এভাবে সকল বন্দী মুক্ত হয়ে যায়।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৩৬৭-৩৬৮)

হযরত উমর (রা.)-এর মেয়ে হযরত হাফসা (রা.)-এর সাথে মহানবী (সা.)-এর বিবাহের বিষয়ে যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা হল, হযরত হাফসার স্বামী বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর অসুস্থ হয়ে মারা যান। পরবর্তীতে মহানবী (সা.) হযরত হাফসার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ বিষয়ে বুখারী শরীফে বিস্তারিত উল্লেখ আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) যখন হযরত হাফসা বিনতে উমর উনায়েস বিন হুযায়ফা সাহমীর (প্রয়াণে) বিধবা হলেন আর তিনি মহানবী (সা.)-এর সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি (রা.) মদীনায় মৃত্যু বরণ করেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি হযরত উসমান বিন আফফানের সাথে সাক্ষাত করি, তাঁকে হাফসার বিষয়ে অবগত করি এবং নিবেদন করি যে, আপনি চাইলে আপনার সাথে হাফসা বিনতে উমরের বিবাহ করিয়ে দিই। তিনি জবাবে বলেন, আপনার প্রস্তাবের বিষয়ে আমি

চিন্তাভাবনা করব। হযরত উমর (রা.) বলেন, এরপর আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করি। কিছু দিন পর হযরত উসমান (রা.) নিবেদন করলেন, আমি এ সময়ে বিবাহ করা সমীচীন মনে করছি না। হযরত উমর (রা.) বলেন, এরপর আমি হযরত আবু বকরের সাথে সাক্ষাৎ করি এবং বলি, আপনি চাইলে আমি আপনার সাথে হাফসা বিনতে উমরের বিবাহ করিয়ে দিতে পারি। হযরত আবু বকর নীরব হয়ে গেলন আর আমাকে কোন জবাব দিলেন না। হযরত উমর (রা.) বলেন, উসমানের তুলনায় তাকে (অর্থাৎ আবু বকরকে) আমার অধিক গররাজি মনে হল [অর্থাৎ মনে হল, তিনি অধিক অস্বীকৃতি জানিয়েছেন]। এরপর আমি কিছুদিন অপেক্ষা করলাম। এরপর মহানবী (সা.)-এর সমীপে হযরত হাফসাকে বিবাহ করার প্রস্তাব প্রেরণ করি এবং অবশেষে তাঁর (সা.) সাথে হাফসার বিবাহ করিয়ে দিই। বিবাহ সমাপনান্তে হযরত আবু বকর আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং নিবেদন করেন, সম্ভবত আপনি আমার পক্ষ থেকে কষ্ট পেয়েছিলেন অর্থাৎ আমি বিবাহের (প্রস্তাবে) অস্বীকৃতি জানানোর কারণে। আপনি যখন আমাকে হাফসার প্রস্তাব দিয়েছিলেন আর আমি আপনাকে কোন জবাব দিই নি? তখন আমি উত্তরে বললাম, জ্বী হ্যাঁ, আমি দুঃখ পেয়েছিলাম। প্রকৃত বিষয় হল, আপনি যখন বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তখন আমাকে উত্তর প্রদানে যে বিষয়টি বাধা দিয়েছিল তা হল, মহানবী (সা.) হযরত হাফসাকে বিবাহের ব্যাপারে এমন কিছু বলেছিলেন- যে বিষয়টি আমি পূর্বেই অবগত ছিলাম আর মহানবী (সা.) এর উক্ত গোপন বিষয় আমি প্রকাশ করতে চাই নি। অর্থাৎ হযরত আবু বকরের (রা.) এ বিষয়টি জানা ছিল যে, মহানবী (সা.) হযরত হাফসাকে বিবাহ করতে মনস্থ করেছিলেন। তিনি (রা.) বলেন, এই গোপনীয় বিষয় আমার দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না কিন্তু মহানবী (সা.) এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে আমি অবশ্যই তোমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যেতাম।

(সহীহুল বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস-৪০০৫)

এই ছিল হযরত আবু বকররের প্রত্যুত্তর। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সীরাতে খাতামান্নাবিয়্যিন পুস্তকে হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব এম. এ. (রা.)ও উল্লেখ করেছেন। তিনি (রা.) লিখেছেন: হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর একজন কন্যা ছিলেন যার নাম ছিল হাফসা। তিনি খুনায়েস বিন হুযায়ফার (রা.) সহধর্মিনী ছিলেন যিনি একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী ছিলেন এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদর যুদ্ধ শেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার পর খুনায়েস (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং উক্ত অসুস্থতা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর কিয়দকাল পর হযরত উমর (রা.) হযরত হাফসার পুনঃবিবাহের বিষয়ে চিন্তিতি হয়ে পড়েন। তখন হযরত হাফসার বয়স কুড়ির বেশি ছিল। হযরত উমর (রা.) সাদা মনের মানুষ হিসেবে হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে নিবেদন করেন, আমার কন্যা হাফসা বর্তমানে বিধবা। আপনি চাইলে তাকে বিবাহ করতে পারেন। কিন্তু হযরত উসমান (রা.)প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন। এরপর হযরত উমর (রা.) একই প্রস্তাব হযরত আবু বকর (রা.) এর নিকট উপস্থাপন করেন, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.)-ও কোন উত্তর না দিয়ে নীরবতা পালন করেন। এটি দেখে হযরত উমর (রা.) নিতান্তই কষ্ট পান এবং এই দু ঃখ ভারাক্রান্ত অবস্থাতেই তিনি মহানবী (সা.) এর সকাশে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। তিনি (আ.) বলেন, হে উমর! তুমি দুশ্চিন্তা করো না, আল্লাহ চাইলে হাফসার ভাগ্যে আবু বকর ও উসমানের চাইতে উত্তম স্বামী জুটবে এবং উসমান হাফসার চাইতে উত্তম স্ত্রী পাবে। তিনি (সা.) এজন্যে একথা বলেছিলেন কারণ তিনি স্বয়ং হাফসার সাথে বিয়ে করার ও নিজ কন্যা উম্মে কুলসুমকে হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে হযরত আবু বকর ও উসমান (রা.) দুজনই অবগত ছিলেন, যেকারণে তারা উভয়ই হযরত উমর (রা.)-প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এর কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে নিজ কন্যা হযরত উম্মে কুলসুমের বিয়ে করিয়ে দেন এবং এরপর নিজে হযরত উমরের নিকট তার মেয়ে হাফসার জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করেন। হযরত উমরের (রা.) এর চাইতে বেশি আর কী-ই বা চাওয়ার ছিল! তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে সেই প্রস্তাবে রাজী হয়ে যান এবং হিজরী ৩ সনের শাবান মাসে হযরত হাফসা মহানবী (সা.)-এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নবী পরিবারভুক্ত হয়ে যান। যখন এই বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়, তখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমরকে (রা.) বললেন: আপনি হয়ত আমার আচরণে (প্রস্তাব পেয়ে নীরব থাকার কারণে) কষ্ট পেয়েছেন। আসলে মহানবী (সা.)-এর স্বংকল্পের বিষয়ে আমি পূর্ব হতেই অবগত ছিলাম, কিন্তু তাঁর (সা.)-এর অনুমতি ছাড়া এই গোপন বিষয়ের কথা আমি প্রকাশ করতে পারতাম না। তবে এটি ঠিক যে মহানবী (সা.)-এর যদি এমনটি করার বিষয়ে সংকল্প না থাকত, তবে আমি স্বানন্দে হাফসাকে বিয়ে করতাম।

হাফসাকে বিবাহ করার একটি বিশেষ যৌক্তিকতা ছিল- তিনি হযরত উমর (রা.) এর কন্যা ছিলেন, যিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী হিসেবে পরিগণ্য ও মহানবী (সা.)-এর বিশেষ নৈকট্যভাজন সাহবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সুতরাং পারস্পারিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার ও হযরত খুনাইস বিন হুযাফার অকালমৃত্যুতে তারা যে শোকাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন, সেই শোক লাঘব করার উদ্দেশ্যে হাফসার সাথে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সমীচীন বলে মনে করলেন। দ্বিতীয় যে যুক্তিসঙ্গাত কারণটি দৃষ্টিপটে রেখে তিনি বিয়েটি করেন তা হলো তাঁর (সা.)-এর যত বেশি স্ত্রী থাকবেন, নারীদের মাঝে, যারা মানবজাতির অর্ধেক বা কোথাও কোথাও অর্ধেকের চাইতেও অধিক সংখ্যায় বিদ্যমান, ধর্মপ্রচার ও ধর্মশিক্ষার বিষয়টি আরও বৃহদাকারে এবং সহজ ও সুন্দর উপায়ে করা সম্ভব হবে।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৭৭-৪৭৮)

হযরত উমর (রা.)-এর বরাতে উহুদের যুদ্ধ সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়। উহুদের যুদ্ধের সময় যখন খালিদ বিন ওয়ালীদ মুসলমানদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ রচনা করে তখন মুসলমানরা সামলে উঠতে পারে নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন: কুরায়শদের সেনাদল প্রায় চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছিল এবং একের পর এক উপর্যুপরি আক্রমণে মুসলমানদের কোনঠাসা করে চলেছিল। হয়ত এরকম পরিস্থিতি থেকে মুসলমানরা কিছুক্ষণ পর সামলে উঠতে পারত, তবে বিপত্তি বাঁধে তখন- যখন কুরায়শদের এক বীর সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন কামেয়া মুসলমানদের পতাকাবাহক মুসআব বিন উমায়রকে আক্রমণ করে, যিনি পতাকা উত্তোলন করে ছিলেন। সে তরবারীর আঘাতে তার (মা'সাব বিন উমায়রের) ডান হাত কেটে ফেলে এবং মুসআব তাৎক্ষণাত অপর হাতে পতাকাটি ধরে ফেলে ইবনে কামেয়ার সাথে লড়াই করার জন্য অগ্রসর হন। তবে সে দ্বিতীয় আঘাতে তার অপর হাতটিও কর্তন করে দেয়, যার ফলে মুসআব তার দুই কাটা হাত একত্র করে পতনমুখী পতাকাটি নিজের বুকের সাথে আগলে রাখার চেষ্টা করেন। তবে তৃতীয়বারের মত ইবনে কামেয়া আঘাত হানে, যার ফলে মা'সাব শহীদ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পতাকাটি অন্য কোন মুসলিম সেনা হয়তো এগিয়ে এসে ধরে ফেলেছিল তবে যেহেতু মুসআবের দেহাবয়ব মহানবী (সা.) এর সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল তাই ইবনে কামিয়া মনে করল, আমি মুহাম্মদ (সা.) কে হত্যা করেছি। আর এটাও হতে পারে যে, এটি তার পক্ষ থেকে শুধুমাত্র ষড়যন্ত্রমূলক ও ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। যাহোক সে মুসআব (রা.) এর শহীদ হয়ে পড়ে যাওয়াতে হৈচৈ আরম্ভ করলো যে, আমি মুহাম্মদ (সা.) কে হত্যা করেছি। এ সংবাদে মুসলমানদের অবশিষ্ট উদ্দ্যমও ভেঙ্গে পড়লো এবং তাদের একতা একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। অনেক সাহাবী হতবিহবল হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন। এ সময়ে মুসলমানরা তিনটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ল। এদের মাঝে একটি দল ছিল তারা যারা মহানবী (সা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ শুনে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ দলটি সবচেয়ে ছোট ছিল। কিন্তু যেভাবে কুরআন

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"
(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)**

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।
(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Badruddin, Neogir hat, (South 24 PGS)**

শরীফে উল্লেখ এসেছে, সে সময়ের বিশেষ অবস্থা ও তাদের অভ্যন্তরীন ইমান ও নিষ্ঠাকে দৃষ্টিপটে রেখে আল্লাহতা'লা তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। দ্বিতীয় দলে তারা ছিলেন যারা পালিয়ে তো যান নি, কিন্তু মহানবী (সা.) এর শাহাদাতের সংবাদ শুনে হয় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন অথবা সেই মুহূর্তে যুদ্ধ করাকে অর্থহীন মনে করতেন আর এজন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একদিকে সরে গিয়ে মাথা নিচু করে বসেছিলেন। তৃতীয় দল যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছিলেন। এদের মাঝে কিছু লোক তারা ছিলেন যারা মহানবী (সা.) এর আশেপাশে একত্রিত ছিলেন এবং আত্মবিলীনতার তুলনাহীন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছিলেন। আর অধিকাংশ ছিলেন তারা যারা বিক্ষিপ্তভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করছিলেন। এরা এবং দ্বিতীয় দলের লোকেরাও যখনই মহানবী (সা.)-এর জীবিত থাকার সংবাদ পেতেন, তখনই উম্মাদের মতো লড়াই করতে করতে তাঁর (সা.) এর চতুর্পাশে একত্রিত হতেন।

যাহোক সে সময় অত্যন্ত ভয়ানক যুদ্ধ চলছিল এবং মুসলমানদের জন্য একটি কঠিন পরীক্ষার সময় ছিল। আর যেভাবে বলা হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ শুনে অনেক সাহাবী নিরাশ হয়ে অস্ত্র ফেলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গিয়েছিলেন। এদের মাঝেই হযরত উমর (রা.)ও ছিলেন যিনি হতাশ হয়ে একদিকে বসে পড়েছিলেন। এরা এভাবেই যুদ্ধক্ষেত্রের একদিকে বসে ছিলেন; এমন সময়ে উপর থেকে একজন সাহাবী হযরত আনাস বিন নাযার আনসারী (রা.) এসে পড়লেন এবং তাদেরকে দেখে বললেন, তোমরা এখানে কী করছো? তারা উত্তর দিলেন, মহানবী (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন। এখন যুদ্ধ করে কী হবে! আনাস (রা.) বললেন, এটাই তো যুদ্ধ করার সময়! যেন রসূলুল্লাহ (সা.) যে মৃত্যু লাভ করেছেন, আমরাও তা লাভ করি। এছাড়া তাঁর (সা.) পর জীবনের কী-ই বা আনন্দ থাকে! তার সামনে হযরত সা'দ বিন মা'য (রা.) আসলেন, তখন হযরত আনাস (রা.) বললেন, সা'দ! আমি তো পাহাড় থেকে জান্নাতের সুবাস পাচ্ছি! এ কথা বলে আনাস (রা.) শত্রুদের সারিতে ঢুকে পড়লেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। যুদ্ধের পর দেখা গেল তার শরীরে আশিটির অধিক আঘাতের চিহ্ন ছিল আর কেউ চিনতে পারছিল না যে, এটি কার লাশ? শেষপর্যন্ত তার বোন তার আঙ্গুল দেখে শনাক্ত করলেন [ইনিই আনাস (রা.)]। (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৯৩-৪৯৫)

উহুদের সময়ে রসূলুল্লাহ (সা.) কতিপয় সাহাবীসহ পাহাড়ের একটি গিরিপথে পৌঁছতেই কাফেরদের একটি দল গিরিপথে আক্রমণ করলো। এদের মাঝে খালেদ বিন ওয়ালিদও ছিল। হুযুর (সা.) সে সময় দোয়া করলেন, 'আল্লাহুম্মা ইন্নাহু লা ইয়ামবাগী লাহুম আইয়া'লুনা'। অর্থাৎ হে আল্লাহ! এরা যেন আমাদের কাছে পৌঁছাতে না পারে। এতে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) কয়েকজন মুহাজেরসহ এসব মুশরিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন এবং মারতে মারতে তাদের তাড়িয়ে দিলেন।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৫৩৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ২০০১)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) লিখেন, আবু সুফিয়ান তার কিছু সঙ্গিকে সাথে নিয়ে সেই পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হয় যেখানে মুসলমানরা সমবেত ছিল, তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাক দিয়ে বলে যে, হে মুসলমানেরা তোমাদের মধ্যে কি মুহাম্মদ আছেন? মহানবী (সা.) বললেন, তোমরা কেউ জবাব দিবে না। তাই, সব সাহাবী নীরব থাকেন। এরপর আবু সুফিয়ান আবু বকর ও উমর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে কিন্তু এবারও মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ মোতাবেক কেউ জবাব দেয় না। এতে আবু সুফিয়ান দাম্ভিকতার ভঙ্গিমায় বলে, এরা সবাই মারা গেছে কেননা তারা জীবিত থাকলে অবশ্যই সাড়া দিত। তখন উমর (রা.) আর সহ্য করতে না পেরে স্বতস্ফূর্তভাবে বলে ওঠেন, হে আল্লাহর শত্রু তুমি মিথ্যা বলছ। আমরা সবাই জীবিত আছি আর খোদা আমাদের হাতে তোমাদের লাঞ্ছিত করবেন। আবু সু ফিয়ান হযরত উমর (রা.)-এর কণ্ঠ বুঝতে পেরে বলেন, উমর! তুমি সত্য করে বল মুহাম্মদ (সা.) কি জীবিত আছেন? হযরত উমর (রা.) বলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ , আল্লাহর অশেষ কৃপায় তিনি জীবিত আছেন আর তোমার সব কথাই শুনছেন। আবু সুফিয়ান কিছুটা নিচু স্বরে বলে, তাহলে ইবনে কামিয়্যা মিথ্যা বলেছে। কেননা, আমি তোমাকে তার চেয়ে বেশি সত্যবাদী মনে করি। এরপর আবু সুফিয়ান খুবই উচ্চস্বরে হাক দিয়ে বলে, উ'লু হুবুল অর্থাৎ হে হুবুল! তোমার মর্যাদা উচ্চ হোক। সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর পূর্বের নির্দেশের কারণে নিশ্চুপ ছিলেন কিন্তু মহানবী (সা.) যিনি নিজের নাম উচ্চারণের সময় নীরব থাকার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন এখন খোদা তালার বিপরীতে প্রতিমার নাম আসায় তিনি অস্থির হয়ে যান এবং বলেন, তোমরা উত্তর দিচ্ছ না কেন? সাহাবা (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসূল, আমরা উত্তরে কী বলবো? তিনি (সা.) বলেন, তোমরা বল আল্লাহু আ'লা ওয়া আজাল অর্থাৎ উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্ব কেবল আর কেবল আল্লাহ তা'লারই। আবু সুফিয়ান বলে, ***লানাল উয্যা ওয়া লা উয্যা লাকুম*** অর্থাৎ আমাদের সাথে উয্যা আছে তোমাদের সাথে উয্যা নেই। মহানবী (সা.) সাহাবীদের বলেন, তোমরা বল, ***আল্লাহু মওলানা ওয়া লা মওলা লাকুম***। উয্যা আর কী জিনিষ! আমাদের সাথে তো সাহায্যকারী হিসাবে আল্লাহ আছেন পক্ষান্তরে তোমাদের সাথে কোন সাহায্যকারী নাই। এরপর আবু সুফিয়ান বলে, যুদ্ধ পানি তোলার বালতির ন্যায় হয়ে থাকে যা কখনো ওঠে কখনো নামে। তাই, আজকের দিনটিকে তোমরা বদরের দিনের প্রতিশোধ মনে করো আর যুদ্ধের ময়দানে এমন লাশ তোমরা পাবে যাদের অঙ্গহানিও করা হয়েছে। আমি এর নির্দেশ দিই নি কিন্তু আমি যখন এ বিষয়টি জানতে পেরেছি তখন আমার লোকদের এহেন কাজ আমার খারাপও লাগে নি। আর আমাদের ও তোমাদের মাঝে পরবর্তী বছর এই দিনগুলোতেই বদরের ময়দানে পুনরায় যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিলাম। একজন সাহাবী এর উত্তরে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী বললো, খুব ভালো, প্রতিশ্রুতি রইল। যাহোক, একথা বলে আবু সুফিয়ান নিজ সঙ্গিদের নিয়ে নিচে নামে এবং কুরায়শ বাহিনী মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৯৮-৪৯৯)

মহানবী (সা.) যখন ওহুদের যুদ্ধের পর মদিনা পৌঁছেন মুনাফেকরা এবং ইহুদীরা আনন্দ উল্লাস করতে থাকে এবং মুসলমানদের এটা সেটা বলতে থাকে আর বলতে থাকে যে, মুহম্মদ রাজত্ব চায় আর আজ পর্যন্ত কোন নবী এতটা ক্ষতির সম্মুখীন হয় নি যতটা তিনি হয়েছেন; তিনি নিজেও আহত হয়েছেন আর সাহাবীরাও আহত হয়েছেন। তারা বলতে লাগল, যারা নিহত হয়েছে তারা যদি আমাদের সাথে থাকতো তাহলে মারা পড়তো না। হযরত উমর মহানবী (সা.)-এর কাছে এসব মুনাফেককে হত্যা করার অনুমতি চান কেননা, তারা এমন কথা বলছিল। তিনি (সা.) বলেন, তারা কি এই সাক্ষ্য দেয় না যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই আর আমি আল্লাহর প্রেরিত রসূল। এরা কলেমা তো পড়ে, নাকি? এতে হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, কেন নয়। এরা মৌখিক দাবি করে ঠিকই কিন্তু একই সাথে কপটতামূলক কথাও বলছে। কিন্তু হযরত উমর (রা.) বলেন, এদের মৌখিক দাবি তরবারির ভয়ের কারণে। অতএব, এখন তাদের প্রকৃত রূপ প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তাই, এখন যখন এদের মনের কথা বেরিয়ে পড়েছে আর আল্লাহ এদের বিদ্বেষের বিষয়টি প্রকাশ করে দিয়েছেন এজন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া উচিত। তাদেরকে শাস্তি দেওয়া উচিত। তিনি (সা.) বলেন, যে-এই সাক্ষ্য প্রদান করে তাকে হত্যা করতে আমাকে বারণ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এই কলেমা পড়ে নেয় আমাকে এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। (আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড,পৃ: ৩৪৮)

এই স্মৃতিচারণ ইনশাআল্লাহ অব্যহত থাকবে এখন প্রয়াত কয়েকজনের স্মৃতিচারণ করতে হবে তাই এই আলোচনা এখানেই শেষ করছি।

কিন্তু এর পূর্বে আমি দোয়ার আহ্বানও জানাতে চাই। আমি গত সপ্তাহেও অত্যাচারিত ফিলিস্তিনবাসীদের জন্য দোয়া করার আহ্বান জানিয়েছিলাম। যদিও যুদ্ধ থেমে গেছে কিন্তু ইতিহাস আমাদের বলে, অল্পকাল বিরতি দিয়ে কোন না কোন স্থান থেকে, কোন না কোন পদ্ধতিতে কিংবা অজুহাতে শত্রুরা এই ফিলিস্তিনবাসীদেরকে অত্যাচারের শিকারে পরিণত করে এবং কোন না কোন উপলক্ষ্য সৃষ্টি হতে থাকে।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

আল্লাহ্ তা'লা তাদের উপর রহম করুন এবং ফিলিস্তিনবাসীরা যেন প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এমন নেতৃবৃন্দ দান করুন যাদের মাঝে বিবেক-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা রয়েছে আর যারা নিজেদের অধিকারের কথা বলতে এবং তা আদায় করতে সক্ষম। একইভাবে যেসব আহমদীরা অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন তাদের জন্যও দোয়া করুন, বিশেষভাবে পাকিস্তানের জন্য। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সুরক্ষিত রাখুন।

আমি আজ যেসব মরহুমের জানাযা আদায় করবো তাদের মধ্যে প্রথম জন হলেন, কাদিয়ানের নায়েব নাযের ইশায়াত কুরায়শী মুহাম্মদ ফযলুল্লাহ সাহেব যিনি গত ২৭ এপ্রিল তারিখে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার মায়ের দাদা এবং পিতার নানা হযরত মুনশী মেহের দীন (রা.)হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন, যাঁর মাধ্যমে তাদের বংশে আহমদীয়াত প্রবেশ করে এবং তাঁর নাম মিনারাতুল মসীহ্র চাঁদা দাতাদের তালিকাতেও লিপিবদ্ধ রয়েছে।

জামেয়া আহমদীয়া থেকে পড়ালেখা শেষ করার পর কুরায়শী সাহেব ২৩ বছর ৫ মাস জামেয়াতে শিক্ষকতা করেন এবং সেখানে কুরআন মজীদ, উর্দু, কালাম, সারফ্ নাহভ্, আরবী সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় পড়ান। তার মোট সেবার কাল ৩৭ বছর ৭ মাস। আল্লাহ্র ফযলে মরহুম মূসী ছিলেন। পশ্চাতে তিনি তার স্ত্রী, এক পুত্র এবং দুই কন্যা রেখে গেছেন। তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কাদিয়ানের নাযের ইশায়াত মাখদুম সাহেব লিখেন, জামেয়াতে তিনি একজন স্নেহভাজন শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রদের সাথে অনেক ভালবাসা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতেন। একান্ত ঈমানদারীর সাথে এবং ওয়াকফের প্রকৃত প্রেরণা নিয়ে সর্বদা কাজ করতেন। ছাত্রদের সময়ানুবর্তিতার শিক্ষা দিতেন ও পালন করাতেন। ভারতের অধিকাংশ মুবাল্লিগ তার ছাত্র এবং তার কাছ থেকে তারা কল্যাণমণ্ডিত হয়েছে। তার প্রকৃতিতে সরলতা বিদ্যমান ছিল। খুবই মিতবাক মানুষ ছিলেন, বেশি কথা বলতেন না কিন্তু অত্যন্ত জ্ঞান ও যুক্তিপূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ কথা বলতেন। ভারত খোদ্দামুল আহমদীয়ার নায়েব সদর হিসেবে সেবা প্রদানের সৌভাগ্যও তিনি পেয়েছিলেন। ৩৪ বছরের একটি লম্বা সময় যাবৎ তিনি বদর পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। মিশকাত-এর সম্পাদকও ছিলেন। 'ভারতে আহমদীয়াতের ইতিহাস' কমিটির সদস্যও ছিলেন। রূহানী খাযায়েনের কম্পিউটারাইজড এডিশনের প্রুফ রিডিং করতে গিয়ে তিনি কিছু ভুল বের করেছিলেন যা পরবর্তীতে তার বলার পরে সংশোধন করা হয়েছিল। অত্যন্ত সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে সবকিছু দেখতেন এবং প্রুফ রিডিং করতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু পুস্তক যা পৃথক আকারে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর সম্পূর্ণ প্রুফ রিডিং করেন, বিশেষভাবে বারাহীনে আহমদীয়া, আরীয়া ধরম, সাত বচন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসব পুস্তকে যেসব উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন তা তিনি মূল উৎস থেকে অর্থাৎ গ্রন্থ এবং বেদ থেকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সমীক্ষা চালিয়ে একেকটি শব্দের উচ্চারণ ও অনুবাদে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো তা নোট করতেন। প্রতিটি বিষয়ে তিনি নিজের গবেষণাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে অভ্যস্ত ছিলেন। আরীয়া ধরম এবং সাত বচন পুস্তকের উদ্ধৃতিগুলো খুঁজে বের করে সেগুলো যাচাই ও সমীক্ষাকরণের কাজটি তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে করেছিলেন। তিনি বলতেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক দু'টি হিন্দু ও শিখদের জন্য দলিল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে আর এ দু'টি পুস্তকই এই দুই ধর্মের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। তাই এগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে চেক করতে হবে এবং উদ্ধৃতিসমূহ সঠিক করতে হবে।

আমাদের পক্ষ থেকে নতুন 'খাত্তে মনযূর' ফন্টে যে কুরআন করীম প্রকাশিত হয়েছে সেটির সফটওয়্যার তৈরিতেও তিনি অনেক কাজ করেছেন। এটি মুম্বাইয়ের একটি কোম্পানীর সাহায্য নিয়ে প্রস্তুত করানো হয়েছিল এবং এক্ষেত্রে তিনি অনেক কাজ করেছিলেন। তিনি এটির সংশোধন ও ত্রুটিমুক্ত রাখতে রাত দিন পরিশ্রম করেছেন। মনজুর ফন্টে কুরআন শরীফ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এরপর তিনি মৌলভী শের আলী সাহেবের ইংরেজি তরজমা কুরআন সংশোধন এবং পরিমার্জনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। যার কাজ প্রায় শেষ আর কিছু দিনের মধ্যেই প্রকাশ করা হবে। এছাড়া মৌলভী ইসহাক সাহেবের কুরআন অনুবাদের কয়েক পারাও তিনি সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। পবিত্র কুরআনের সেবায় তিনি পরিশ্রমের সাথে অনেক কাজ করেছেন। বিশেষ ভাবে মনজুর ফন্টে কুরআন অনুবাদের ক্ষেত্রে তার বিশেষ অবদান আছে।

নাযের ইশায়াত সাহেব লিখেছেন, মরহুম আমার শিক্ষক এবং মামা শশুর ছিলেন। তা সত্ত্বেও আমার সহকারী হিসেবে আমার পূর্ণ আনুগত্য করেছেন। তিনি অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ের সাথে কথা বলতেন। কখনও বলেন নি, আমি তোমার শিক্ষক কিংবা সম্পর্কে তোমার চেয়ে বড়। মরহুমের ছাত্রদের মধ্যে কেউ লিখেছেন, ক্লাসে তিনি বলতেন যে, জামেয়াতে শিক্ষা জীবনে তিনি কখনও ছুটি নেননি। এরপর তার শিক্ষক জীবনেও যখন তিনি জামেয়াতে পড়াতেন কখনও ছুটি নেননি। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ সৈয়দ বশির উদ্দিন আহমদ সাহেবের, যিনি জামাতের মুরব্বি এবং কাদিয়ানের বাসিন্দা ছিলেন। ৮৩ বছর বয়সে তিনি মৃর্তুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন। তিনি মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাহাবী হযরত সৈয়দ সাঈদ উদ্দিন সাহেব (রা.) এর নাতি ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ইবাদতগুযার, তাহাজ্জুদ আদায়কারী, দোয়াগু সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। মরহুম ওসীয়্যতকারী ছিলেন। তিনি শোক সন্তপ্ত পরিবারে তিন ছেলে রেখে গেছেন। তিন ছেলেই আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করছেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ বাশারত আহমদ হায়দার সাহেবের। যিনি কাদিয়ানের একজন ওয়াকফে জিন্দেগী ছিলেন। তার পিতার নাম ফয়েয আহমদ সাহেব শাহ্না। তিনি গত কিছুদিন পূর্বে ৭১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন। তিনি হযরত আব্দুল করিম সাহেব (রা.), যার সম্পর্কে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কুকুরের কামড় সংক্রান্ত নিদর্শন ছিল তার নাতি ছিলেন। তিনি জীবন উৎসর্গ করে কর্ণাটক থেকে কাদিয়ানে আসেন। এরপর মাদ্রাসাতুল আহমদীয়ায় শিক্ষাজীবন শেষ করে বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করেন। এরপর তিনি রিশতানাতা বিভাগের ইনচার্জ নিযুক্ত হন। তিনি ৪৬ বছর জামাতের সেবা করেছেন। আয় কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত সাদাসিদে জীবন যাপন করতেন। অত্যন্ত চরিত্রবান ও দয়ালু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি ওসীয়্যতকারীও ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে মরহুম তিন মেয়ে রেখে গেছেন। যাদের তিনি উত্তম শিক্ষা দিয়েছেন এবং সবার বিয়ে ওয়াকফে জিন্দেগীদের সাথে দিয়েছেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ মোকাররম ডাক্তার মুহাম্মদ আলী খান সাহেবের যিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত পেশাওয়ারের জেলা আমীর ছিলেন। তিনি গত মাসে ৬৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন। তিনি ইন্টারমেডিয়েটের ছাত্র থাকাকালীন নিজেই বয়আত করে জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। তিনি বলতেন, আমি আমার চাচার দোকানে বসে ছিলাম। সেখানে একজন সম্মানিত ব্যক্তি আসেন। তার চলে যাওয়ার পর আমার চাচা বলল যে, তুমি জান এই ব্যক্তি কাদিয়ানী! আর কাদিয়ানীরা অনেক ভালো মানুষ হয়ে থাকে। এভাবে সর্বপ্রথম আমি জামা'তের সম্পর্কে জানতে পারি। পুনরায় মেডিকেল কলেজে তার একজন সহপাঠী আহমদী ছিল। তিনি তাকে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি কী, জীবিত মান নাকি মৃত তা জিজ্ঞেস করেল ডা. মুহাম্মদ আলী সাহেব বলেন, আমি তো তাকে মৃত মানি। একথা শুনে আহমদী সেই ছাত্র চিন্তা করে, তাহলে তাকে তবলীগ করা উচিত। যাহোক এরপর তিনি তাকে মিশন হাউজে নিয়ে যান, সেখানে তাকে জামা'ত সম্পর্কে অবগত করান। সেখানে তখন বাশারত বশীর সিন্ধি সাহেব মুরব্বী ছিলেন। তাকে প্যান্টশার্ট পরিহিত অবস্থায় দেখে প্রভাবিত হন আর (মনে মনে বলেন,) মৌলভী হলেও বেশ আধুনিক মৌলভী। যাহোক, তিনি অর্থাৎ বশারত সাহেব তাকে দাওয়াতুল আমীর পুস্ত ক পড়তে দেন। তিনি বলেন, আমি সেদিনই তা পড়ে শেষ করি, ফলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, আহমদীয়াত সত্য। ১৯৭৩ সনে তিনি বয়আত করেন এবং ১৯৭৪ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তার বয়আত মঞ্জুর করেন। ১৯৭৪ সনে তার আহমদী হওয়ার পরপরই বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্যও শুরু হয়ে যায়। তখন তার কলেজের ছেলেরা দল বেধে তাকে পাকড়াও করে বলে, আহমদীয়াত ত্যাগ কর (তারা জেনে গিয়েছিল যে, তিনি আহমদী।) অন্যথায় তোমাকে আমরা শহীদ করে ফেলব, হত্যা করে ফেলব। যাহোক কলেজের ব্যবস্থাপনা তখন কিছু করতে পারে নি। সেই যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ছিলেন বাচা খানের ছেলে আলী খান। তিনি সেখানে এসে তাকে তাদের কাছে থেকে মুক্ত করে নিজের সাথে নিয়ে যান এবং নিজের গাড়িতে করে শহরের বাইরে নিয়ে রেখে আসেন। তিনি বলেন, সেখান থেকে আমি খালি পায়ে

হেঁটে হেঁটে আমার গ্রামে যাই। এ অবস্থা দেখে তার পিতা তাকে বলেন, তুমি নিজেও নিজেকে কষ্টে নিপতিত করছ আর আমাদেরও দুর্নাম করছ। তুমি আহমদীয়াত পরিত্যাগ করছো না কেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমি আহমদীয়াত ছাড়তে পারব না। যাহোক তিনি বলেন, পিতার সাথে আমার ধর্ম নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকে আর অবস্থার অবনতির কারণে পড়াশোনাও চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। খুবই খারাপ অবস্থা ছিল, কিন্তু আহমদীয়াতের ওপর প্র তিষ্ঠিত থাকেন। একদিন তার পিতা বলেন, এ সমস্যার ইতি টানো আর আহমদীয়াত ছেড়ে দাও। একথা শুনে তিনি বলেন, এ সমস্যা সমাধানের জন্য আমার কাছে একটিই উপায় রয়েছে আর তা হলো আমাকে খাবার পাঠানোর সময় তাতে বিষ মিশিয়ে দিবেন যাতে আমি মরে যাই আর আপনার সমস্যারও সমাধান হয়ে যায়, (অর্থাৎ তার পিতার)। কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামা'তকে আমি ছাড়তে পারব না। এরপর তার পিতা তাকে আর কখনোই আহমদীয়াত ছাড়তে বলেন নি। তার পিতা মৃত্যুবরণ করলে তিনি তাকে দেখতে যান, কিন্তু জানাযার নামায পড়েন নি। লোকেরা বলে, এটি গোষ্ঠির রীতিনীতির ঘোর বিরোধী এবং অত্যন্ত ঘৃণার ছলে বলে, কেমন সন্তান! নিজ পিতার জানাযা পড়ে নি। এর উত্তরে তিনি বলেন, আমার কাছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি আর বাকি সব এরপর। অনুরূপভাবে তার মা তার সাথে অনেক খারাপ ব্যবহার করেন। তিনি বলেন, তুমি আমার ছেলে নও আর এরপর তাকে তার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে দেন। এরপর তিনি আর তার গ্রামে যান নি, কিন্তু মাকে সাহায্য করতেন। তার বড় চাচার বাড়ি যেতেন, সেখান থেকে মায়ের খোঁজখবর রাখতেন আর তাকে আর্থিক সাহায্যও করতেন। তিনিও যখন মারা যান তখন তার জানাযাও পড়ে নি। অনুরূপভাবে তিনি তার এক ছোট ভাইকেও আহমদী বানিয়েছিলেন, তিনিও জানাযা পড়েন নি। এরপর এবিষয়েও মানুষ আপত্তি করে বলে, কেমন ছেলে! তখনো তিনি একথাই বলেন যে, এটি জামা'তের মর্যাদার বিষয়, তারা যেহেতু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)কে গালাগালি করতেন, তাই আমরা (তাদের) জানাযা পড়তে পারি না। তিনি অসাধারণ আত্মাভিমান প্রদর্শন করেন। তিনি ২৭ বছর সেনাবাহিনীতে দায়িত্ব পালন করেন এবং লেফটেনেন্ট কর্নেল পদে থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ডাক্তার ছিলেন। অবসর গ্রহণের সময় তিনি রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র সেনা পদকে ভূষিত হন। এরপর তিনি পেশাওয়ারের নাসীর টিচিং হাসপাতালে সহকারী প্রফেসর হিসেবে কাজ করতে থাকেন এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধানও ছিলেন। হযরত খলীফাতু ল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে ৩২ বছর বয়সে সীমান্ত এবং পেশাওয়ার জামা'তের আমীর নিযুক্ত করেন। ১৯৮৫ সনে তাকে ওয়াকফে জাদীদের বোর্ড অব ডাইরেক্ট নিযুক্ত করেন। তিনি আমৃত্যু এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ওয়াকফে জাদীদের বোর্ড অব ডাইরেক্টরের সদস্য ছিলেন। অনুরূপভাবে ফযলে উমর ফাউন্ডেশন, তাহের ফাউন্ডেশ এবং স্টেডিং শূরার সদস্য ছিলেন। তার ছোট ভাই কর্ণেল আইয়ুব সাহেব, যার কথা আমি উল্লেখ করেছি, তিনিও আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। সীমান্ত প্রদেশের প্রাদেশিক আমীর শামসু দ্দীন খান সাহেবের কন্যার সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। তার অবর্তমানে স্ত্রী ছাড়াও এক ছেলে ও তিন মেয়ে রয়েছে। ছেলে ওয়াকফে নও স্কীমের অন্তভু ক্ত এবং বর্তমানে তানজানিয়ায় হিউম্যানিটি ফার্স্টের ব্যবস্থাপনার অধীনে দায়িত্ব পালন করছে। সে লিখেছে, ডা. মুহাম্মদ আলী খান সাহেব সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, নিঃস্বার্থতা ও বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে এক বিশেষ বিশিষ্ট মর্যাদা রাখতেন। কখনোই ধনসম্পত্তি, টাকা-পয়সা, পার্থিব সম্পদ বা অন্য কোন জিনিসের কথা বলতেন না [তার প্রত্যেক সন্তানই একথাই লিখেছে] আর সর্বদা অত্যন্ত প্রশান্ত ও সন্তুষ্ট জীবন অতিবাহিত করেছেন। সর্বাবস্থায় , বিশেষত পেশোয়ারে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এবং খোদা তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের ওপর আস্থা রেখে পেশোয়ার জামা'তের নেতৃত্ব দিয়েছেন। পেশোয়ারের মানুষ তার মৃত্যুতে অত্যন্ত ব্যথিত। খিলাফতের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল এবং এর আনুগত্যের ক্ষেত্রেও আদর্শ ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসা, মহানবী (সা.)-এর প্রতি প্রেম এবং আল্লাহ্ তা'লার তওহীদ বা একত্ববাদের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত, এমন অগণিত গুণাবলীর অধিকারী এক ব্যক্তি ছিলেন।'

পরবতী স্মৃতিচারণ হলো রাবওয়ার জনাব মুহাম্মদ রাফী খান শাহজাদা সাহেবের; গত ৩০ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। মরহুম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত গোলাম রসূল আফগান সাহেব ও আয়েশা পাঠানী সাহেবা(রা.)-এর দৌহিত্র এবং হযরত আব্দুস্ সাত্তার খান সাহেব ওরফে বুযুর্গ সাহেবের প্রদৌহিত্র ছিলেন। ইবাদতে একনিষ্ঠ ছিলেন এবং যুবক বয়স থেকেই তাহাজ্জুদ পড়তেন। ধর্মের জন্য অত্যন্ত আত্মাভিমান ও গভীর আবেগ রাখতেন, অত্যন্ত পবিত্রচেতা ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। শেষ অসুস্থতার সময়ও হাসপাতালে শ্বাসকষ্ট সত্ত্বেও উচ্চঃস্বরে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে থাকতেন। একসময় তিনি আবুধাবি চলে গিয়েছিলেন। তিনি আবু ধাবিতে বিমান বাহিনীতে যোগ দেন, সেখানে বিমান বাহিনীর এসেম্বলীতে কোন মৌলবী বলে বসে, 'কাদিয়ানীরা ওয়াজিবুল-কতল (হত্যাযোগ্য)।' তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আমি আহমদী, আমাকে হত্যা কর!' কিন্তু যাহোক, এরপর পদত্যাগ করে সেখান থেকে তিনি পাকিস্তানে চলে আসেন। এখানে এসে নিজের মেডিকেল স্টোর খোলেন এবং এই সময়কালে রাজেকীর পশ্চিম দারুর রহমত মহল্লার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ও পালন করেন। তেমনিভাবে এমটিএ-র অনুষ্ঠান 'পশতু মুযাকেরা' (পশতু আলাপন)-এরও প্রায় ৫০টি পর্বে অংশগ্রহণ করেন। পাড়ার প্রতিটি ব্যক্তির সাথে তার অত্যন্ত স্নেহার্দ ও পিতৃসু লভ আচরণ ছিল। লোকজনকে গোপনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতেন। তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। শোকসন্ত প্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও দুই ছেলে ও চার মেয়ে রেখে গিয়েছেন।

পরবতী স্মৃতিচারণ হলো অস্ট্রেলিয়ার আইয়্যায ইউনুস সাহেবের, ২৪ মার্চ তারিখে অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস স্টেটে বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়ায় তার মৃত্যু হয়, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ একজন যুবক ছিলেন। প্রেসিডেন্ট সাহেবকে বলে রেখেছিলেন, আপনার যে কাজেই প্রয়োজন হয় আমাকে নির্দেশ দেবেন, আমি চলে আসব। সর্বদা সেবার জন্য তৎপর থাকতেন এবং সবাইকে বলে রেখেছিলেন, 'আমার ঘরের দরজা খোলা আছে, যখনই সাহায্যের প্রয়োজন চলে আসবেন।' সবাইকে অনেক বেশি সাহায্য সহায়তা করতেন। যাহোক, তিনি যুবক ছিলেন, এখনো বিয়ে হয় নি, সরকার তার মৃত্যুতে তার পিতামাতাকে পাকিস্তান থেকে আসার জন্য ভিসাও দিয়েছে এবং সরকারি প্রতিনিধির উপস্থিতিতে তার দাফনকার্য সম্পন্ন হয়েছে।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ মিয়াঁ কুরবান হোসেন সাহেবের পুত্র মিয়াঁ তাহের আহমদ সাহেবের। তিনি রাবওয়ার ওকালাতে মাল সালেসের প্রাক্তন কর্মী ছিলেন। তিনি আমাদের এখানে ইসলামাবাদ প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার ইদ্রিস আহমদ সাহেবের পিতা। তিনি ৬৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন; ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাই রাজীউন। স্থানীয় জামা'তে তিনি সেক্রেটারী তরবিয়ত ছিলেন। তিনি আনসারুল্লাহ্র নায়েব সদর এবং যয়ীম হিসেবে সেবাদান করেন। তিনি রীতিমত তাহাজ্জুদ এবং নফল নামায পড়তেন, নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি একজন মূসী ছিলেন। তার অবর্তমানে তিনি স্ত্রী ছাড়া দুই মেয়ে এবং তিন ছেলে রেখে গিয়েছেন।

পরবতী স্মৃতিচারণ যুক্তরাজ্যের ফারুক আফতাব সাহেবের পিতা রফিক আফতাব সাহেবের। তিনিও গত এপ্রিল মাসে ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন; ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাই রাজীউন। ফারুক সাহেব লিখেন, আমার পিতা বহু গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন বিনয়ী, নম্র স্বভাবের, সদালাপী, প্রফুল্ল প্রকৃতির, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং অতিথিপরায়ন একজন মানুষ ছিলেন। এছাড়া অনেকেই আমাকে ফোন তার এসব গুণাবলীর সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। সন্তানসন্ততিকেও তিনি সর্বদা খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার জন্য জোর তাগিদ প্রদান করতেন আর এর ফলস্বরূপ সন্তানরা আজ জামা'তের সেবাও করে যাচ্ছে।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ জামেয়া আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের শিক্ষক জনাব মির্যা নাসির আহমদ চিট্টি মসীহ্ সাহেবের স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া জেরিনা আক্তার সাহেবার। তিনি গত মাসে মৃত্যুবরণ করেন; ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাই রাজীউন। তিনিও সাহাবার সন্তান ছিলেন আর অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল ও কৃতজ্ঞ মহিলা ছিলেন। তিনি তার পিতামাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি সবার উত্তমরূপে সেবা করেছেন। ওয়াকেফে জিন্দেগী স্বামীর সাথে বিশ্বস্ততা ও স্বল্পেতুষ্ট থেকে জীবন কাটিয়েছেন। ঘানায় তিনি ভীষণ অর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যেও অগাধ ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞচিত্তে সন্তানদের নিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন, কখনো টু শব্দটিও করেন নি। মরহুমা মূসী ছিলেন। তার এক পুত্র মির্যা তৌকির আহমদ ওয়াকেফে জিন্দেগী হিসেবে এম.টি.এ.-তে কর্ম রত আছেন।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 24 June, 2021 Issue No.25

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আজ ইউরোপের গবেষকরা একথা স্বীকার করে যে, যদি আরবের মুসলমানেরা না থাকত, তবে পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান সেই উচ্চতায় থাকত না যেমনটি বর্তমানে রয়েছে। আর আধ্যাত্মিকতার জগতে আরবরা যে উন্নতি করেছে তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কোন জাতির মধ্যে পাওয়া যায় না।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা ইব্রাহিম এর ২৯ নং অ া য়া ত

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

এর ব্যাখ্যায় বলেন:

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে কুরআন করীম একটি জ্যোতি যার দ্বারা মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে বের করে নিয়ে যাবে। অতঃপর জ্যোতির ব্যাখ্যা করেছে اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ এর দ্বারা। অর্থাৎ আযিয ও হামীদ খোদার পথই হল প্রকৃত জ্যোতি। আমরা দেখতে পাই জ্যোতি সকলেই পছন্দ করে, কিন্তু ব্যক্তি সাপেক্ষে জ্যোতির ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। আজকাল লোকে বলে, এরা নতুন আলোর মানুষ, যার অর্থ আধুনিক দর্শন ও সভ্যতা, নতুন কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ধর্মহীনতার অনুসরণ করা। কেউ বলে খৃষ্টবাদ হল খোদার জ্যোতি, কেউ হিন্দু ধর্মকে আবার কেউ ইসলামকে খোদার নুর আখ্যায়িত করে। এই আয়াতে বলা হয়েছে, অন্তঃসারশূন্য রীতি-রেওয়াজকে খোদার জ্যোতি বলা যায় না। জ্যোতি হল খোদা তা'লার দিকে অগ্রসর হওয়ার নাম। যে ব্যক্তি খোদার পানে পদবিক্ষেপ করে না, তাকে কোনওভাবেই খোদার জ্যোতিলাভকারী বলা যায় না। সেই ব্যক্তিই জ্যোতি লাভ করে যে আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হয়। আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণের জন্য এখানে দুটি গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে- আযীয ও হামীদ। আযীয-এর অর্থ পরাক্রমশালী আর হামীদ-এর অর্থ প্রশংসার যোগ্য। এই দুটি গুণাবলী নির্বাচন করার কারণ, একটি কর্মগত জ্যোতির সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে অন্যটি জ্ঞানগত যুক্তির উপর। 'আযীয'-এর সঙ্গে মিলে মানুষ তার শত্রুর উপর জয়যুক্ত হয় এবং বাহ্যিক অন্ধকার, অর্থাৎ দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ দূরীভূত হয়। আর হামীদের সঙ্গে মিলে মানুষ নিজের অভ্যন্তরীণ শত্রু শয়তানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। আর অভ্যন্তরীণ অন্ধকার অর্থাৎ প্রবৃত্তির প্ররোচনা, সংশয় এবং অজ্ঞতা দূর হয়।

মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে উভয় কর্মই সম্পাদিত হয়েছে। আরবদের লাঞ্ছনা, দারিদ্র ও পশ্চাদশীলতাও দূর হয়েছে, আর তাদের অজ্ঞতা, শিরক এবং চারিত্রিক দুর্বলতাও দূর হয়েছে। একদিকে তারা সমগ্র জগতের বাদশায় পরিণত হয়েছে অপরদিকে তারা গোটা পৃথিবীর শিক্ষক হয়ে উঠেছে। রসুল করীম (সা.)-এর আগমণের পূর্বে আরবদের অবস্থা এবং তাঁর আগমণের পর সংঘটিত পরিবর্তন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি থেকে। হযরত উমর (রা.)-এর যুগে যখন ইরানের উপর আক্রমণ করা হয় তখন ইরানের বাদশাহ তার কমান্ডর ইন চিফকে একথা বলে পাঠায় যে তাদেরকে কিছু পুরস্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যুদ্ধ মিটিয়ে দাও। আর পুরস্কারও ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। অর্থাৎ সিপাহী পিছু এক বা দুই দিনার। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে আরবরা তাদের প্রতিবেশি জাতিগুলির দৃষ্টিতে অত্যন্ত হতদরিদ্র, মুখাপেক্ষী এবং উদ্যমহীন ছিল। কিন্তু ইসলাম তাদের কি রূপ রূপান্তর ঘটাল! তা এই ঘটনা থেকে জানা যায় যে, তারা যে কেবল ইরান জয় করল তাই নয়, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিশর আর্মেনিয়া, ইরাক, উত্তর আফ্রিকা, হাসপেনিয়া, আফগানিস্তান, ভারত ও চীন পর্যন্তও প্রথম শতাব্দীর মধ্যে জয় করা হয়।

সাহাবা যারা হতদরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষ ছিলেন, তারা এমন বিত্তবান হয়ে উঠলেন যে আব্দুর রহমান বিন অউফ নামে এক সাহাবা যখন মৃত্যু বরণ করলেন, তখন তার পরিত্যক্ত সম্পদের পরিমাণ ছিল আড়াই কোটি টাকা যা বর্তমান যুগের নিরিখে অনেক বড় সম্পদ। কেননা সেকালে রুপীর মূল্য অনেক বেশি ছিল। দ্বিতীয় পরিবর্তনও বাহ্যিক। আরবের মানুষ যারা লেখাপড়াকে দোষের মনে করত, কোনও প্রকারের জ্ঞান তাদের কাছে ছিল না, তারাই সমগ্র জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক ও বাহক হয়ে উঠল। তারাই ইতিহাসের ভিত রচনা করল। ব্যকরণ, অভিধান, বর্ণনা করার পদ্ধতিকে তারা পরম উৎকর্ষে পোঁছে দিল। ফিকাহশাস্ত্র, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, প্রজ্ঞা, চিকিৎসাশাস্ত্র, রাজনীতি, স্থাপত্যকলা, পাটিগণিত, বীজগণিত, রসায়ণবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান এর উদ্ভাবন করল অথবা সেগুলিকে অঙ্কুরাবস্থা থেকে উন্নতির শিখরে পোঁছে দিয়েছে। আজ ইউরোপের গবেষকরা একথা স্বীকার করে যে, যদি আরবের মুসলমানেরা না থাকত, তবে পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান সেই উচ্চতায় থাকত না যেমনটি বর্তমানে রয়েছে। আর আধ্যাত্মিকতার জগতে আরবরা যে উন্নতি করেছে তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কোন জাতির মধ্যে পাওয়া যায় না।

(তফসীরে কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩৮-৪৩৯)

(২য় খুতবার শেষাংশ.....)

পরবর্তী জানাযা জনাব হাফিয মুহাম্মদ আকরাম সাহেবের। চলতি মাসে তিনি তাহের হার্ট ইন্সিটিটিউটে ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন; ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজীউন। তাদের পরিবারে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর মাধ্যমে আহমদীয়াতের বার্তা পোঁছায়। এরপর তার দাদা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে তাঁর হাতে হাত রেখে বয়আত করেন নি বটে কিন্তু লিখিত বয়আত করেছিলেন। তার এক দৌহিত্র আব্দুল খবীর রিযওয়ান এখানে যুক্তরাজ্যে পি.এস.-এর দপ্তরে দায়িত্ব পালন করছে। তিনি নিজেও জামা'তের সেবায় নিজেকে উপস্থাপন করেন আর সত্যায়নের জন্য ফয়সালাবাদের সাবেক আমীর মুহাম্মদ আহমদ মাযহার সাহেবের কাছে গেলে তিনি তাকে বলেন, আপনি ধর্মসেবা করবেন! তাহলে আপনি এখানে আমার কাছে থেকে ধর্মসেবা করুন। অতঃপর তিনি তার সারাটি জীবন ফয়সালাবাদ জামা'তের একজন কর্মী হিসেবে কাটিয়েছেন এবং সবসময় ধর্মকে জাগতিকতার ওপরে প্রাধান্য দিয়েছেন।নিজেকে তিনি একজন জীবন উৎসর্গকারী মনে করতে। তিনি মূসী ছিলেন এবং তার জীবদ্দশাতেই নিজের হিস্যায়ে জায়েদাদ পরিশোধ করে দিয়েছেন। তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন আর কখনো বাদ পড়ত না। ফয়সালাবাদে তিনি অনেক শিশু-কিশোরকে পবিত্র কুরআন পড়ানোর এবং কুরআন মুখস্থ করানোর সৌভাগ্য লাভ করেছেন। নিজের ছোট ছেলেকেও তিনি কুরআন শরীফ মুখস্থ করিয়েছেন।

পরবতী স্মৃতিচারণ মোহতরম চৌধুরী নূর আহমদ নাসের সাহেবের, যিনি ৮২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন; ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজীউন। তিনি কাদিয়ানের দরবেশ চৌধুরী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার দুই পুত্র ওয়াকেফে জিন্দেগী। একজন হলেন মনসুর আহমদ নাসের যিনি আমাদের লাইবেরিয়া জামা'তের স্কুলের প্রিন্সিপাল আর অন্যজন হলেন মাসরূর আহমদ মুযাফ্ফর সাহেব, তিনি ঘানায় মোবাল্লেগ হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করছেন। এ দুজন ছেলেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে পিতার জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। মরহুম একজন মূসী ছিলেন।

পরবর্তী জানাযা হাকীম উবায়দুল্লাহ্ মিনহাস সাহেবের পুত্র জনাব মাহমুদ আহমদ মিনহাস সাহেবের। তিনি গত মাসে ৭৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন; ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাই রাজীউন। তার এক পুত্র রাশেদ মাহমুদ মিনহাস সাহেব (জামা'তের)মোবাল্লেগ। তিনি বলেন, মরহুম একজন দরবেশ প্রকৃতির মানুষ এবং বহু গুণের আধার ছিলেন। তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। খিলাফতের প্রেমিক এবং দরিদ্র অসহায়দের সাহায্য করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। তার এই পুত্রও ঘানায় কর্মরত থাকার কারণে জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। অনুরূপভাবে আরেক পুত্র মালয়েশিয়াতে অবস্থান করার কারণে জানাযায় শরিক হতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা এই সবাইকে, অর্থাৎ এসব মরহুমের সন্তানসন্ততি এবং আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য্য ও মনোবল দান করুন আর সকল মরহুমের মর্যাদা উন্নিত করুন এবং তাদের সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন। জুমুআর নামাযের পর তাদের জানাযার নামায পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir